গদ্যের সৌন্দর্য

ড° শ্রীগুণময় মান্না
অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়



এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅমূল্যকুমার দাস

প্রথম সংস্করণ ঃ ২ আগস্ট ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশন্যাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

পরম পূজনীয় আচার্য

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

শ্রীচরণেষু

নিবেদন

আধুনিক কালে কবি ও কবিতা, তুলনায়, গদ্যলেখক ও গদ্য-রচনার থেকে সংখ্যা এবং পরিমাণে অনেক কম। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, বিজ্ঞাপনে, বেতারে সর্বত্র গদ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষ মুখোমুখি হচ্ছেন, যেমন হচ্ছেন কলকাতার ফুটপাতে জনতার সঙ্গে।

গদ্যের এই অজস্র নমুনার সংস্পর্শে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী? একথা ধরে নেওয়া ভুল হবে, কেবল বিদগ্ধ জনই তাবৎ রচনার সৌন্দর্য বা কুশ্রীতা সম্বন্ধে সচেতন বা বিচারপরায়ণ। পণ্ডিত মানুষকেই আমি বরঞ্চ অনেক সময় চুপ করে থাকতে দেখেছি, হয়তো সঙ্গত কারণে; কিন্তু সিনেমায়, ভর্তি ট্রেনের কামরায়, বেতারের সামনে সাধারণ মানুষকে বল্গাহীন মন্তব্য (নিন্দা ও প্রশংসামূলক দুইই) করতে শুনেছি, তাঁদের সাধ্যায়ত্ত যুক্তিপ্রয়োগের সঙ্গেই। সুতরাং গদ্যের 'Discriminating' পাঠ বা শ্রবণে এদের চিত্ত যে উৎসুক দ্বিধাহীনভাবে আমি তা স্বীকার করি।

কিন্তু এঁদের কথাবার্তায় যে অভাবটা আমার চোখে পড়েছে, তা হচ্ছে এঁরা যে মানদণ্ডে বিচার করেন, তার অসম্পূর্ণতা। গদ্যের লক্ষণ কী, অপকৃষ্ট গদ্য থেকে পৃথক করে ভালো গদ্যকে কী ভাবে চিনে নেওয়া যায়—তার একটা মানদণ্ড আছে। আমার এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ পাঠকের হাতে গদ্য বিচারের সেই মাপকাঠি তুলে দেওয়া।

গ্রন্থের প্রথমে এই উদ্দেশ্যে গদ্যের কয়েকটি মৌল লক্ষণ নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। মতভেদের আশঙ্কা আছে বলেই খুঁটিনাটিতে যাইনি। বরঞ্চ কেমন করে গদ্যের বিচার করতে হয়, অর্থাৎ সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে হয়, সেই উদ্দেশ্যে নমুনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উৎসাহ বোধ করেছি খুঁটিনাটিতে যাবার। বিভিন্ন সময়ের গদ্যলেখকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার উদাহরণ এই লক্ষ সামনে রেখে আহরণ করা হয়েছে। কিছু কিছু অনুচ্ছেদও সংকলিত হয়েছে পাঠকদের স্বাধীন অনুশীলনীর জন্য।

তাছাড়া, আমাদের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক মিলিয়ে একটা বিরাট অংশই হচ্ছে গদ্য রচনা। কোনো কোনো পাঠক্রমের প্রশ্নপত্রে গদ্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতেও

বলা হয়। সুতরাং সাধারণ পাঠক ছাড়া ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছেন আমার সামনে।

দুটি কথা মনে আসছে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে, সৎ কবিরাই ভালো গদ্য লিখেছেন। এর কারণ হয়তো এই যে, ঔচিত্যবোধ ও শব্দসচেতনতা তাঁদের অনেক বেশি। আর, একেবারে আধুনিক কালে, ধরুন বিগত দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই, বেতারভাষ্য, সংবাদপত্র, ছাত্রপাঠ্য পুস্তক, এমন কি পণ্ডিতদের লেখা গবেষণাধর্মী নিবন্ধ বা গ্রন্থ, দুঃখের বিষয় হলেও বলতে হচ্ছে অজস্র অপকৃষ্ট গদ্য-রচনার উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

বোধ করি, সেই জন্য এখনই, গদ্যের শিল্পাঙ্গিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট আমাদের সকলেরই সচেতন, উৎসুক ও সক্রিয় হওয়া উচিত।

শ্রীগুণময় মান্না

সূচীপত্র

অনুশীলনীর জন্য

অনুশীলনীর জন্য

অনুশীলনীর জন্য

অনুশীলনীর জন্য

প্রবেশক

১

গদ্ ধাতুর অর্থ কথা বলা। যে রচনায় কথা বলার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় তাকেই গদ্য বলা যেতে পারে। সুতরাং কথা বলার যে সৌন্দর্য তাই হচ্ছে গদ্য-সৌন্দর্য। কথা বলা কখন সুন্দর হয় অর্থাৎ কোন কথা বলা আমাদের ভালো লাগে? এ প্রশ্নের উত্তর অনেকখানি বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল, যার সঙ্গে আমাদের ক্রমে পরিচিত হতে হবে। এখানে আপাতত বলে রাখা যায়, কথা বলার উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ বলা কথাটি রূপে সম্পূর্ণতম হয়, তখনই তাকে সুন্দর বলি।

আমরা কথা বলি কেন? তার অনেকগুলি কারণ আছে। কথা বলে আমরা প্রধানত তথ্য বা সংবাদ জানতে বা জানাতে চাই। আমরা বাজার-দর জিজ্ঞেস করি, পথের কোনো দুর্ঘটনার কথা প্রতিবেশীর কাছে বর্ণনা করি, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করি, কোনো তরুণ-তরুণীর আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে গল্প জমাই ইত্যাদি। আবার কখনো বাজার-দর থেকে দুর্মূল্যতা, আর সেখান থেকে পৌঁছই অর্থনীতিতে। কখনো রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা থেকে পৌঁছই, ধরা যাক, গণতন্ত্র বনাম সাম্যবাদের বিতর্কে। আবার, কখনো কোনো নদী-প্রান্তরের ওপর ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার পরিবর্তমান রঙ আর ছায়ার জন্য হৃদয় যে ভরে আসে, বা বুকের ভেতর অব্যাখ্যাত শূন্যতাও শ্বসিয়ে ওঠে - তার কথা ভাবি, বা অন্য হৃদয়ে আমার অনুভূতির কথা পৌঁছে দিতে চাই।

গদ্য লেখার পিছনে কারণ হিসেবে এ সব ছাড়াও আরো অনেক মুখ্য-গৌণ প্রবর্তনা থাকতে পারে। আর সেই সব উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুসারে গদ্য-রচনার মোটামুটি তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা

যায় : ক. বর্ণনাত্মক গদ্য, খ. বিশ্লেষণাত্মক গদ্য এবং গ. আবেগাত্মক গদ্য।

এই বিভাগ বস্তুত স্থূল, কেননা, এক তো উক্ত তিনটি বিভাগ ছাড়াও উদ্দেশ্যের পার্থক্য অনুসারে রচনার নতুন নতুন শ্রেণী দেখা দেয় ; তাছাড়া, একই শ্রেণীভুক্ত এক গদ্য-রচনার সঙ্গে অন্য গদ্য-রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্যও হয় অনেকখানি। এক লেখকের রচনার সঙ্গে অন্য লেখকের রচনার পার্থক্য তো আছেই, একই লেখকের বিভিন্ন রচনার মধ্যেও পার্থক্য ঘটে। 'একই লেখক'-এর কথাটাই ধরা যাক : তাঁর মানসিকতা, লেখার সমকালীন মেজাজ, লেখার উপাদান ও সেই উপাদানকে দিয়ে তিনি কী কাজ করাতে চান, তার ওপর তাঁর নিজের রচনারই প্রকৃতি সময়ে সময়ে, এমন কি একই সময়ে বদলে যাচ্ছে। তাছাড়া, মৌলিক প্রতিভাশালী লেখকের রচনার মধ্যে এক শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্য শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের অবিরত অন্যোন্য-সংস্পর্শ ঘটছে। তবু, কাজ চালাবার সুবিধার জন্য মোটামুটি ভাবে উক্ত শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করে নিয়ে এগোন যেতে পারে।

২

বিভিন্ন দেশে সাহিত্য-গুণান্বিত যে সব উল্লেখযোগ্য ভাষা প্রচলিত আছে, সে সবের দুটিই প্রধান রূপ—গদ্য ও পদ্য। সুতরাং পদ্যের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনার দ্বারাই গদ্যের বিশিষ্ট লক্ষণ কী তা চিনে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, গদ্যের বিপরীত পদ্য, কিন্তু কাব্য নয়। কেননা, কবিত্ব গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনার মধ্যেই থাকতে

পারে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা 'কাদম্বরী'-কে কাব্য বলতে কুণ্ঠিত হন নি। এখনকার দিনে 'কপালকুণ্ডলা' কিংবা 'শেষের কবিতা'-র কবিত্ব সর্বজন-স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' কিংবা বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র কবিত্বগুণও স্বীকৃত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, এমন অনেক পদ্য-রচনা আছে যাকে কাব্য বলতে অসুবিধে হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ অংশবিশেষে কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে ওটি চরিতগ্রন্থ ও দার্শনিক-নিবন্ধ রূপেই গ্রহণীয় নয় কি ? —যা আধুনিক কালে নিঃসন্দেহে গদ্যেই লিখিত হত।

উপাদান-বিচারেও গদ্য ও পদ্যের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না, কেননা গদ্যে ও পদ্যে প্রায় একই রকম উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পদ্যের প্রাথমিক উপাদান শব্দ, গদ্যেরও তাই। গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতেই ছন্দস্পন্দ অনুভূত হয়। অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার এবং উপমা-রূপক প্রভৃতি অর্থালংকার গদ্য এবং পদ্য উভয়েই আহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং কেবল উপাদান বিশ্লেষণ করে পদ্যের তুলনায় গদ্যের নিজস্ব প্রকৃতিটি বুঝে নেওয়া অসম্ভব।

অথচ ঠিক এই উপাদানগুলি অবলম্বন করেই যেমন পদ্যের, তেমনি গদ্যের বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে। **সে বিশিষ্টতা তাদের সজ্জা বা সংগঠনের বিভিন্ন রীতির ওপর নির্ভর করে।** পদ্য-লেখক শব্দ এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, গদ্য-লেখক আর এক কথা মনে রেখে। বাক্য-সমূহ পদ্যে এক রকম করে, আর গদ্যে অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়। ছন্দ পদ্যে যেমন সংগঠিত হয়, গদ্যে তেমন হয় না। আর অলংকার—ধরা যাক রূপক, গদ্যেও প্রচুর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। সুতরাং গদ্যের বিচারে কী উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, কেমন করে সেগুলি সংগঠিত হচ্ছে সেটাই লক্ষ করার জিনিস।

এসব কথা মনে রেখে, গদ্যে এই সব উপাদান কীভাবে সংগঠিত

হয়, তার ওপর এখানে আলোকপাত করা যেতে পারে, যাতে গদ্যের কয়েকটি মৌল লক্ষণ পরিস্ফুট হতে পারে।

ক. গদ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দণ্ডী একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, 'অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্'—পাদবদ্ধ নয় এমন পদসমূহ গদ্য। 'পদ' এবং 'পাদ' শব্দ দুটি এখানে ভিন্ন জাতের অভিধারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পদ' শব্দটির অর্থ ব্যাকরণগত, অর্থাৎ বাক্য-ধৃত শব্দ। আর 'পাদ' শব্দের অর্থ, ইংরেজিতে যাকে বলে metrical structure, ছন্দের সংগঠিত রূপ, যা আমরা বাংলায় পর্ব-পদ-চরণ ইত্যাদি অভিধা ব্যবহার করে বুঝিয়ে থাকি। একটু ব্যাখ্যা করছি। শব্দের সঙ্গে শব্দ সম্মিলিত হলে, যে তরঙ্গিত ধ্বনি-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় ছন্দস্পন্দ, rhythm। সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা, সম্মিতিবোধ, শ্বাসগত সীমাবদ্ধতা, এমন কি অর্থগত প্রয়োজনেও, সেই ধ্বনিপ্রবাহে যতিপাত (pause) ঘটে থাকে। যদি কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসারে (রচয়িতার অভিপ্রায় অনুযায়ী সে প্যাটার্ন যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন) সেই যতিপাত সংগঠিত হয়, তবে সেই রচনাকে পাদবদ্ধ বা ছন্দবন্ধযুক্ত বলা যাবে, যা পদ্যের প্রধানতম লক্ষণ। গদ্যে সেই পাদবদ্ধতা থাকে না। অথচ সুলিখিত গদ্যে ছন্দস্পন্দও থাকে, যতিও পড়ে, কিন্তু তা অতিশয় লক্ষণীয় হয় না, কোনো আদর্শ অনুসারে সংগঠিতও হয় না।

পদ্যের যতিপাত সুনিয়মিত এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে ধ্বনিগত প্রয়োজনীয়তাই সেই যতিপাতকে নিয়ন্ত্রিত করে। পদ্যের অর্থবিভাগকে কবিরা নিয়মিত করেন ধ্বনিযতি অনুসারে। ধ্বনিবিভাগ নির্দিষ্ট, স্থির—অর্থ তার অনুগামী। পদ্যের আধুনিকীকরণের কালে কবিরা চেষ্টা করেছেন অর্থবিভাগকে ধ্বনিবিভাগের সমপাতী করার, কিন্তু সেই পর্যন্তই; বলা হয় নি অর্থবিভাগ অনুসারে ধ্বনিবিভাগ নিয়ন্ত্রিত হবে (কেবল ব্যতিক্রম আছে গদ্য-কবিতার ছন্দ-রচনার ক্ষেত্রে, যা পরীক্ষামূলক প্রয়াসের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যাকে গদ্য না পদ্য বলা হবে সে বিষয়েও সংশয় আছে)।

পক্ষান্তরে, গদ্যে অর্থবিভাগের প্রয়োজনীয়তাই সার্বভৌম, ধ্বনিযতি এবং তন্নির্ভর ছন্দস্পন্দ অর্থবিভাগকেই অনুসরণ করে। ফলে গদ্যে ছন্দ আছে, ছন্দস্পন্দ আছে এসব কথা বলা যাবে, কিন্তু বলা যাবে না যে তাতে ছন্দবন্ধ বা পাদবদ্ধতা আছে।

দোলে রে প্রলয়দোলে | অকূল সমুদ্রকূলে |
উৎসব-ভীষণ। [১] ॥

এ কথা জানিতে তুমি | ভারত-ঈশ্বর শাজাহান, ॥
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধনমান। [২] ॥

হায় | কি পরিতাপের বিষয় ! | যে দেশের পুরুষ জাতির | দয়া নাই, | ধর্ম নাই, | ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, | হিতাহিত বোধ নাই, | সদসদ্বিবেচনা নাই, | কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম | ও পরম ধর্ম, | আর যেন সে দেশে | হতভাগা অবলা জাতি | জন্মগ্রহণ না করে।[৩] ॥

প্রথম দুটি উদাহরণে যতিপাত সুনিয়ন্ত্রিত, কবি-প্রস্তাবিত একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থবিভাগকে ধ্বনিযতির অনুগত ও সমপাতী করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় অংশে অর্থবিস্তারের বিভাগগুলি নিজের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনবশে সম্পন্ন হয়েছে, ধ্বনিযতি পরিকরের মতো অনুসরণ করেছে তাকেই। আরো লক্ষণীয়, প্রথম দুটি অংশে ধ্বনিস্পন্দ সোচ্চার, পদ্য-রচনায় কবির সেটাই অভিপ্রেত ; কিন্তু তৃতীয় উদাহরণে ধ্বনিস্পন্দ মুখর হয় নি, তা কতকটা চাপা ; গদ্যের পাঠ কখনোই সুরেলা হয় না, ধ্বনিমান শব্দসমূহ আহৃত হওয়া সত্ত্বেও।

---

১ রবীন্দ্রনাথ, 'সিন্ধুতরঙ্গ', "মানসী"
২ রবীন্দ্রনাথ, 'শাজাহান,' "বলাকা"
৩ বিদ্যাসাগর, "বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব"

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, | পৃথিবী, |
শেষ নমস্কারে অবনত | দিনাবসানের বেদিতলে ‖
মহাবীর্যবতী, | তুমি বীরভোগ্যা |
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে, |
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি | পুরুষে নারীতে ; |
মানুষের জীবন | দোলায়িত কর তুমি | দুঃসহ দ্বন্দ্বে।[১] ‖

গদ্য-কবিতার এই উদাহরণে, কবি যদিও দাবি করেছেন এর শব্দ-গ্রন্থন গদ্যের রীতি অনুসারেই হয়েছে, তথাপি একে বিশুদ্ধ গদ্য বলা যাবে না। কারণ, এক তো এতে অন্বয়ের ক্ষেত্রে গদ্যের বিশুদ্ধতা নেই, তাছাড়া বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো পঙ্‌ক্তিবিভক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ এর পদ্যের মতো পাঠ বা আবৃত্তি করাও কবির অভিপ্রেত। গদ্য-কবিতা এক মিশ্র-রীতির রচনা, যার মধ্যে পদ্য বা গদ্য কোনোটিরও স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে না।

খ. গদ্যের বৈশিষ্ট্য আর এক দিক থেকে অনুধাবন-যোগ্য। পদ্য ও গদ্যের বৈলক্ষণ্য বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন'। তাঁর প্রসিদ্ধ 'গদ্য ও পদ্য' ("পঞ্চভূত") প্রবন্ধে এই রূপকটির তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অনুসরণে বলা যেতে পারে : মানুষ অহরহ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে, তার প্রতিটি অভিঘাতে আমাদের চিত্তের যে জাগরণ হয় তার দুটি দিক থাকে। এক দিকে রয়েছে আমাদের বোধ বা মনন, cognition, আর অন্য দিকে রয়েছে আবেগ, feeling। অবশ্য প্রত্যেকটি বিশিষ্ট জাগরণ বা অভিজ্ঞতার মধ্যে উক্ত দুটি দিকের আপেক্ষিক প্রাধান্য-অপ্রাধান্য থাকে। এমন কোনো মনন বা জ্ঞান নেই যার সঙ্গে কিছু না কিছু আবেগ জড়িত ; পক্ষান্তরে আবেগ মাত্রেই কোনো না কোনো জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে রচনার প্রধান আবেদন মননের কাছে তাকেই বলা হয় গদ্য ; আর যে রচনায় আবেগকেই প্রধান করে তোলা হয় তা পদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তবু রবীন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্যের এই যে বৈলক্ষণ্য নির্দেশ করেছেন, আমাদের অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরলে তার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা থেকেই যায়। 'গদ্য বহির্ভবন' একথার মধ্যে দ্ব্যর্থকতা নেই : গদ্যের আবেদন পাঠকের মননের কাছে, সুতরাং অর্থস্ফুটতাই তার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু 'পদ্য অন্তঃপুর' বলে যেখানে তিনি হৃদয়ানুভূতির কথা বলেছেন, সেখানে কবিত্বের কথা এসে পড়ে (তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে সে কথা এসেওছে), যা, আমরা আগেই বলেছি, গদ্য-পদ্য দু'রকম রচনাতেই থাকতে পারে। কবির কথাটি আমাদের কাছে এই ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে : গদ্যের মনন বা অর্থস্ফুটতাই তার প্রধান ধর্ম, তারই অনুগত হয়ে 'অন্তঃপুর' বা কবিত্ব আসতে পারে।

গ. গদ্যরচনায় মননের কাছে আবেদন এবং অর্থস্ফুটতা যদি সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে গদ্যের গঠনরূপ (structure) অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আমরা পূর্বেই গদ্য ও পদ্যের সাধারণ উপাদান হিসেবে যে শব্দ, বাক্য, ছন্দ এবং অলংকার ইত্যাদির কথা বলেছি, সেগুলির এক বিশেষ রীতির ব্যবহারই গদ্যকে গদ্য করে তোলে। সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে এখানে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে।

গদ্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রাথমিক কৃত্য বাচ্যার্থকে পরিস্ফুট করা, যার পিছনে শব্দের অভিধা-শক্তি সক্রিয় ; লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ গদ্যে থাকে না তা নয়, কিন্তু পদ্যে যেখানে সেগুলি বাচ্যার্থের ওপরে প্রাধান্য-বিস্তার করে, প্রকৃত গদ্যে তা সর্বদাই বাচ্যার্থের অনুগত হয় ('প্রকৃত গদ্য' বলছি এই জন্যে যে জাত-খোয়ানো পদ্য বা গদ্য দু'রকম রচনাই হামেশাই চোখে পড়ে)।

গদ্যে ও পদ্যে উভয় ক্ষেত্রেই বাক্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গদ্যে বাক্য-প্রকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদ্যে বাক্যের অন্বয় খণ্ডিত, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিন্যাস ও সজ্জা বিপর্যস্ত হতে পারে, কিন্তু অন্বয়ই হচ্ছে বাংলা গদ্যের বাক্যের প্রাণ। এ ব্যাপারে সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজির সঙ্গে

তার সাদৃশ্য বেশি। সংস্কৃতের অন্বয় মুক্তরীতির, ইংরেজির মতো বাংলা বাক্যের অন্বয়ের একটা বলিষ্ঠ দাবি আছে, ভাষার অর্থ-বিস্তার-ক্রম ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে। 'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে হয়'—বাংলা গদ্যের সেই প্রারম্ভিক স্তরে রামমোহন বাক্যের অন্বয়ের ওপর এই যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা তাঁর গদ্য-সম্পর্কিত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বাংলা বাক্যের প্রধান দুটি বিভাগ—কর্তা এবং ক্রিয়া; অন্যান্য শব্দগুচ্ছ বা তন্নির্ভর অর্থবিভাগগুলি এদের সঙ্গে যুক্ত হয় সম্প্রসারক হিসেবে, নামবিশেষণগুচ্ছ, ক্রিয়াবিশেষণগুচ্ছ ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন কারকের প্রয়োজনে। অর্থবিস্তার-ক্রমের অপরিহার্য প্রয়োজনে সংগতি এবং ঔচিত্য বজায় রেখে উক্ত অর্থ-বিভাগগুলিকে বিন্যস্ত করতে হয়, সে সময় লক্ষ রাখতে হয় এমন কি সেগুলির ধ্বনিগত ও ছন্দস্পন্দগত সংগতির দিকেও। বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করাও বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে সমান প্রয়োজনীয়, লেখকের অভ্রান্ত শিল্প-বোধের ওপর তা নির্ভরশীল। সংস্কৃত বাক্যে যে এই ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব নেই, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে সকৌতুক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন।

পদ্যে ক্ষেত্র-বিশেষে স্তবক-গঠনের দায়িত্ব আছে, কিন্তু গদ্যে অনুচ্ছেদ (paragraph)-গঠন অপরিহার্য। অর্থস্ফুটতা যেহেতু গদ্য-রচনার সার্বভৌম লক্ষণ, সেজন্য গদ্যের বাক্যগুলি গুচ্ছবদ্ধ হয়ে তাদের পালাক্রমে একটি বৃহত্তর অর্থবিভাগকে রূপ দান করে, যেগুলিকে কোনো বৃহৎ রচনার ভাবগ্রন্থি বলা যেতে পারে। অর্থ-বিস্তারের সূচনা-মধ্য-অন্ত অনুসারে গদ্য-প্রবন্ধের অনুচ্ছেদগুলিও এক একটি পরিচ্ছিন্ন একক। লেখকের তৎস্থানিক মর্জি অনুসারে অনুচ্ছেদগুলি বিভিন্ন আয়তনের হতে পারে। আবার উক্ত একই অর্থ-বিস্তারের আরোহ-অবরোহ ক্রমানুসারে, এবং সৌন্দর্য বৈচিত্র্য

প্রভৃতির প্রয়োজনে, একই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যযুক্ত বাক্যের সমাবেশ ঘটতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য যা-ই হোক, বা পৃথক্‌ভাবে কোনো একটি বাক্য যতই সুগঠিত হোক, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও অনুধাবনযোগ্য। প্রকৃত গদ্যে (আবার 'প্রকৃত' কথাটা ব্যবহার করছি) অনুচ্ছেদ-গঠনের অভিমুখে বাক্যগুলি প্রধানত দুটি রীতিতে গ্রথিত হয়—নৈয়ায়িক (যুক্তিসিদ্ধ বা লজিক্যাল) বা পরম্পরাগত শৃঙ্খলায়। ভুলে যাচ্ছি না যে কাব্যিক বা অন্য রীতিতেও বাক্যগুলি গ্রথিত হতে পারে, কিন্তু সে রীতি গদ্যের এলাকায় (অবাঞ্ছিত ?) আগন্তুক।

বাংলা গদ্যের বাক্য-গঠন ও বাক্যসমূহের পারস্পরিক গ্রন্থনের এই অনন্য গুরুত্বের বিষয়টি লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পদের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তি-সম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে ; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভারসামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, সেই পদব্রজবিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টলটলে হইয়া থাকে।'[১]

৩

আমরা গদ্যের তিনটি মৌল লক্ষণের কথা এইমাত্র আলোচনা করেছি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থ লিখিত হচ্ছে, তার কথা মনে রেখে, শেষোক্ত লক্ষণ, অর্থাৎ গদ্যের গঠনরূপ (structure) সম্বন্ধে আরো দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

গঠন বা স্ট্রাক্চারের বিশ্লেষণের বস্তু হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ একক। গদ্যের প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে শব্দ। তারপর, বিভিন্ন বাক্যাংশে শব্দগুলি গুচ্ছবদ্ধ হয়ে অর্থবিভাগের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেগুলি অর্থানুষক্ত হয়ে এক একটি বাক্য গঠন করে। সেটি আর এক বৃহত্তর একক। বাক্যসমূহ গুচ্ছবদ্ধ হয়ে পরিণত হয় একটি অনুচ্ছেদে। আগেকার পরিচ্ছেদে আমরা গদ্যের গঠনরূপের এই তিনটি এককের কথা কিছু আলোচনা করছি। কিন্তু অনুচ্ছেদই গদ্যের গঠনরূপের শেষ কথা নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ গদ্য-প্রবন্ধে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থাকে। সেখানে অনুচ্ছেদগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সমাবেশ ও সংহতির পারম্পর্য গদ্য-বিশ্লেষকের আলোচনার বিষয়। কোনো একটি গদ্য-গ্রন্থে খণ্ড, খণ্ডগুলি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদেও বিভক্ত হয়। এর সবই গঠনরূপের আলোচনার অন্তর্ভূত, কারণ গ্রন্থের খণ্ড বা পরিচ্ছেদগুলি বিষয়-বিভাগ, অর্থ-বিস্তারের ক্রম ও পরিণতি এবং সর্বোপরি লেখকের চিন্তাধারার প্যাটার্ন্ সূচিত করে।

বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন গদ্য-লেখকের যে সব রচনাংশ উদ্ধৃত করে সেগুলির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছি—তাতে শব্দ, বাক্য এবং অনুচ্ছেদ—গঠনরূপের এই তিনটি এককের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

এখন, গদ্যের গঠনরূপ, প্রকৃতপক্ষে বহু বিচিত্র স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানের উপর নির্ভরশীল: শব্দ-প্রয়োগ, বাক্য-গঠন রীতি, অনুচ্ছেদ-গঠন, ছন্দস্পন্দ ও ছন্দবিভাগ, অর্থবিভাগ, মনন ও আবেগ, বিভিন্ন শব্দালংকার ও অর্থালংকার প্রভৃতি। গদ্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা কোনটি বা কোনগুলির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব ?

একথা এখন নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে যে রচনার সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ একই সঙ্গে অংশগত ও সামগ্রিক। কারণ, সার্থক রচনা মাত্রেই, তা সে গদ্য বা পদ্য যাই হোক না কেন, ইটের ওপর ইট সাজিয়ে গড়ে তোলার মতো নয়, তা কোনো উদ্ভিদ বা মানুষের মতোই সজীব সৃষ্টি। সুতরাং রচনার তাৎপর্য তার কোনো অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ প্রাণের অস্তিত্ব যেমন জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমেত সমগ্র দেহের মধ্যে ব্যাপ্ত, রচনার সৌন্দর্য তেমনি সমগ্রের মধ্যেই নিহিত। অথচ রচনার অংশ বা উপাদান-বিশেষ মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়, কেননা সেটি তার নিজের দিক থেকে উক্ত সমগ্রের প্রতি ইঙ্গিত করে।

আমাদের কৃত গদ্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণের সময় এ তত্ত্ব মনে রাখা হবে।

8

আমরা কথা বলছি, গল্প করছি, লেখকেরা বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য-রচনা করছেন—এ সবেরই লক্ষ প্রকাশ করা, কমিউনিকেশন বা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু লেখক কী প্রকাশ করেন? এর সহজ উত্তর হচ্ছে—বিষয়বস্তু। যেমন, মায়াবাদ, রামমোহন, পরমাণু শক্তি, সিমলা চুক্তি, কলকাতার বাসে জনতার চাপ, কাব্যে বাস্তবতা,

গদ্যের আঙ্গিক প্রভৃতি। কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে: তাহলে একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখক লেখেন কেন এবং পাঠক বিভিন্ন জনের একই বিষয়ের লেখা পড়েন কেন? পাঠক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে থাকেন, 'বিষয় একই হলেও বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য বিভিন্ন, সুতরাং বিভিন্ন লেখা পড়তেই হয়'। আমরা যে কথাটি প্রস্তাব করবার অভিমুখে এগোচ্ছি, কিছু-না-ভেবে-বলা পাঠকের এই সম্ভাব্য উক্তিটির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। বিভিন্ন রচনার মধ্যে তিনি একই বিষয়বস্তু পান কিন্তু পাঠক যদি জিজ্ঞাসু হন তাহলে তিনি খোঁজেন বিভিন্ন 'বক্তব্য': তার অর্থ বিষয়বস্তু পেরিয়ে তিনি খোঁজেন অন্য কিছু, এমন কি বক্তব্যকে পেরিয়েও। আমাদের কথা হচ্ছে, কোনো বিশেষ রচনার বিষয় ও বক্তব্যকে অবলম্বন অথচ অতিক্রম করে যা তিনি পান, তা হচ্ছে বিশেষ লেখকের চিত্তের স্পর্শ, রঙ উত্তাপ স্বর সমেত লেখকের চেতনার সমগ্রতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, পার্সন্যালিটি।

একটা চরম উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। ধরা যাক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট গণিত। আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত গ্রন্থকারের পক্ষে এ বিষয়ে নতুন কিছু করার নেই। কিন্তু তবু কোনো গ্রন্থকারের রচিত গণিতের বই শিক্ষার্থীদের কাছে তুলনায় বাঞ্ছিততর হয় কেন? তার কারণ, গণিতের অতিনির্দিষ্ট বিষয়কে তিনি এমনভাবে উপস্থাপিত করেন, হয়তো এমনভাবে তত্ত্ব ও উদাহরণের সজ্জা ও বিন্যাস করেন, যার মধ্যে তাঁর চিত্তের ভঙ্গিটি ফুটে ওঠে এবং বিষয়বস্তুর দাবি পেরিয়েও সেটি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। তারপর, সংবাদপত্রের গদ্যকে আমরা নৈর্ব্যক্তিক বলেই গ্রহণ করে থাকি এবং প্রধানত সে রচনা তাই-ই, তবু কোনো সম্পাদকের সম্পাদকীয়, কোনো সাংবাদিকের বিশেষ ধরনের নিবন্ধ আমাদের কাছে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের জিনিস হয়ে ওঠে কেন?

এ দুটি উদাহরণ লেখকের ঠিক ব্যক্তিত্বের নয়, কিন্তু তদভিমুখ

নির্দেশকের : এমন কি গণিত বা সাংবাদিকতার মতো সাধারণত-স্বীকৃত নৈর্ব্যক্তিক বিষয়েও। কারণ ব্যক্তিত্বেরও নানা স্তর আছে তা ওপর-ওপর থেকে আরম্ভ করে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পরিব্যাপ্ত। যে লেখক যত বেশি প্রতিভাশালী তাঁর ব্যক্তিত্ব-চেতনা তত বেশি গভীর ও ব্যাপকভাকে প্রসারিত। সেজন্যে গণিত-রচনা বা সাংবাদিকতার মধ্যে নয়, আমরা শিল্পি-ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছিন্ন মূর্তির অনুসন্ধান করি সৃষ্টিধর্মী, মননশীল গদ্য-রচনার মধ্যেই যাকে চলতি কথায় আমরা 'সাহিত্যিক গদ্য' বলে থাকি।

এখন, এই ব্যক্তিত্বটিকে কীভাবে চিনে নেওয়া যায় ?

এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই আছে : লেখকের ব্যক্তিত্ব চেনা যায় তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই। শব্দের পর শব্দ গেঁথে তিনি যে বাণীমূর্তি রচনা করছেন তার মধ্যে নিজেকেই তিনি রূপ দিয়ে চলেছেন। যেমন, হাসি মানব-সাধারণ, কিন্তু এক এক জনের হাসির ভঙ্গিমাটি এক এক রকম, আর সেই বিশিষ্ট ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে সেই বিশেষ মানুষকে দূর থেকেও চিনে নেওয়া যায়—তেমনি কোনো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লেখকের শব্দ-সঞ্চয় ও সমাবেশ, বাক্যের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, অনুচ্ছেদ-গঠনের রীতি, যুক্তি-ব্যবহার বা আবেগ-মূলকতা, ভাষার সংগীতধর্মের মৃদুতা-প্রবলতা প্রভৃতি বিশিষ্টতার মধ্যেই তাঁকে চিনে নিতে হয়।

এ ব্যাপারে লেখকের দান ও পাঠকের পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বিস্ময়ের বিষয় আছে। লেখক মনে করেন তিনি তাঁর বিষয়বস্তুকেই উপস্থিত করছেন আর তারই প্রয়োজনে শব্দ-গ্রন্থন করছেন ; পাঠক মনে করেন লেখকের ব্যবহৃত শব্দ-সমূহের মধ্য দিয়ে তিনি প্রস্তাবিত বিষয়কেই পাচ্ছেন। কিন্তু এই মাধ্যমটিকে অবলম্বন করেই লেখকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাঠকের চেতনার মুখোমুখি হচ্ছে। এই সংস্পর্শের জন্যই বিশেষ লেখকের লেখা বিশেষ পাঠকের ভালো লাগে।

৫

একই বিষয়ে লেখা হলেও, কিরূপ অনিবার্যভাবে এক লেখকের কণ্ঠস্বর অন্যের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাঁদের স্বীয় ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অনুসারে, একটা উদাহরণ নিয়ে তা বুঝবার চেষ্টা করছি। নিচে তিন জন সমালোচকের রচনা থেকে তিনটি অংশ তুলে নেওয়া হচ্ছে। তিন জনই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের স্ব-কৃত সমালোচনার উপসংহার টানছেন। আমি এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না, যা এই প্রসঙ্গের শেষে করা হয়েছে। পাঠককেও সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি।

এক

কপালকুণ্ডলার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্ময়বিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা উপন্যাসটির অনবদ্য গঠনকৌশল। উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিতে সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ়-কলাকৌশল-নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ঈর্ষাদ্বন্দ্ব পর্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারানাসক্তি, স্বামিপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্বল, গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনীর অতর্কিত আবির্ভাব,

সর্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসংকেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ—এক সঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথরজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর, সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে, নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

দুই

···· 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই এইরূপ একটি সংঘটনা—সেই অকস্মাৎ নদীতে জোয়ার আসাই—সমগ্র কাহিনীর ভিত-পত্তন করিয়াছে। এই ঘটনাটি না ঘটিলে, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার উভয়ের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পরিণতি লাভ করিত, এবং হয়ত তাহাতে কিছুমাত্র রোমান্সের অবকাশ থাকিত না। ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়বোধ হইবে। কিন্তু ঐ ঘটনাটি যে আদৌ অস্বাভাবিক বা অবাস্তব নয়, এবং এইরূপ একটিমাত্র ঘটনাই যে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ শাসিত করিয়া তাহার সুখদুঃখের নিয়ামক হইতে পারে—কবি বঙ্কিমের এই দৃষ্টির বা জীবনরহস্যবোধের অন্তর্ভূত, এই কাহিনীর সমগ্র ঘটনাধারা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাপর উপন্যাসেও এই chance, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা রূপে মানব-ভাগ্যের তথা জীবন-কাহিনীর একটা বড় দিক্ অধিকার করিয়া আছে। অথচ ইহা অদৃষ্টবাদ নয়, ইহা যেন সৃষ্টির মূল নিয়মের সঙ্গেই মানব-জীবনের একটা স্বাভাবিক গ্রন্থি; ইহার কোনো ব্যাখ্যা নাই, কোন কারণ-নির্দেশ নাই; এই জন্যই ইহা জীবনকে এমন রহস্যময় করিয়া তোলে। মানবজীবনের যিনি শ্রেষ্ঠ কাব্যকার সেই শেক্‌স্‌পীয়ারের মত, বঙ্কিমচন্দ্রও কেবল ইহাকে দেখিয়াছেন মাত্র; তাহার রহস্যরসে তিনিও যেমন অভিভূত হইয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব কবিপ্রতিভার বলে তেমনি আমাদিগকেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। জীবনের কেবল বাস্তব প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপই নয়, তাহার ঊর্ধ্বতম শিখর ও নিম্নতম তলদেশ—লক্ষ্য ও অলক্ষ্য, বস্তুগত ও ভাবগত, যুক্তিগ্রাহ্য ও যুক্তিরও অগ্রাহ্য—সর্বাঙ্গীণ রূপটি, যে-কবি আমাদের যতখানি অনুভূতিগোচর করিতে পারেন তিনিই সেই হিসাবে তত বড়

কবি ; সেই কবির কাব্যই সুগভীর সৃষ্টি-সত্যে অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় সেই স্পর্শমণির স্পর্শ আছে, তাই তাঁহার কাব্যগুলিতে মানব-জীবন-কাহিনীর একটি অভিনব রস-সংবেদনা আমাদিগকে এমন উৎকণ্ঠিত করে।

তিন

কপালকুণ্ডলার শিল্পকলায় এমন একটি অনায়াসলব্ধ অযত্ন-আয়ত্ত সৌকুমার্য আছে যে, অন্যত্র তাকে আমি স্বপ্ন-সম্ভূত বলেছি। এ যেন লেখকের সচেতন চেষ্টার ফল নয়, স্বপ্নে-পাওয়া দুর্লভ দৈবধন। এর মধ্যে শক্তির প্রকাশের চেয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্যের প্রকাশ বেশি। শক্তির প্রকাশ আছে রাজসিংহে। ভারতেতিহাসের দুর্ধর্ষ পাহাড় কুঁদে মূর্তিগুলি তৈরী, সে সব মূর্তি বিরাট ও শক্তিপুঞ্জ ; সীতারাম চরিত্রও বিরাট ও শক্তিপুঞ্জ, তবে তাদের গায়ে বাটালির দাগগুলো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, তাদের উদ্বেল মাংসপেশীতে নৈপুণ্যের চেয়ে শক্তির প্রকাশ অধিক। কিন্তু কপালকুণ্ডলা আর এক জাতের শিল্পকলা, ও কেমন করে সম্ভব হল স্বয়ং লেখকও সদুত্তর দিতে পারবেন না। সেই জন্য ও বস্তুটিকে নিয়ে লেখক বেশি নাড়াচাড়া করেন নি, কেবল আলগোছে শেষের ভুলটিকে ঝরিয়ে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে কপালকুণ্ডলা অনন্যসোসর, হয়তো বা পৃথিবীর সাহিত্যেও, কল্পনার উন [ঊর্ণ] তন্তুধৃত শিশিরাশ্রুর কাছে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় হয়, স্পর্শ করবার কথা তো ওঠেই না। কপালকুণ্ডলা মনুষ্যচেষ্টা-প্রসূত নয়, Magic Hand of chance-এর অপার্থিব কীর্তি।

তিনটি রচনার মধ্যেই দু'একটি সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, তিন জনেই তাঁদের 'কপালকুণ্ডলা'-সমালোচনার উপসংহার রচনা করছেন। তিন জনেই 'কপালকুণ্ডলা'-র অনন্য উৎকর্ষ সম্বন্ধে একমত। তিন জনেই 'কপালকুণ্ডলা'-র কল্পনার গভীরতা ও শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিস্ময়বিমুগ্ধ। অথচ এই সব

সামান্য লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রচনার আস্বাদন-পরিণাম বিভিন্নতা লাভ করেছে ॥

তিনটি রচনার মধ্যে প্রথমটি অবিমিশ্র সাধুভাষার গদ্যে রচিত, শেষেরটি চলিত ভাষায় ; এবং দ্বিতীয়টির ক্রিয়াপদের রূপ যদিও সাধু গদ্যের, তথাপি বাক্যের চালে এবং উচ্চারণ-ভঙ্গিতে চলতি ভাষার আদল লক্ষণীয়। তিন জনেই প্রধানত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তৎসম শব্দের ধ্বনিপ্রকৃতির পার্থক্য আছে। প্রথম উদাহরণে শব্দগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সন্ধি-সমাসের প্রবণতা বেশি। দ্বিতীয় লেখক মনে হয় সন্ধি-সমাস পরিহার করতে চেয়েছেন ; তৃতীয় উদাহরণে সন্ধি-সমাস আছে কিন্তু সেটাই একটা বিশেষ প্রবণতা হয়ে ওঠে নি। ধ্বনিপ্রকৃতির দিক থেকে প্রথম দুটি উদাহরণ এক একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করতে চেয়েছে। সংস্কৃত রীতিতে শব্দের স্বর-ব্যঞ্জন স্পষ্ট উচ্চারিত হতে চায়, হ্রস্ব-দীর্ঘের পার্থক্য সমেত ; কিন্তু বাংলা কথ্যরীতিতে স্বরের উচ্চারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ক্ষয়ে যাবার দিকেই। প্রথমটির তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারিত ; দ্বিতীয়টিতে বাংলা রীতিতে, সুনীতিকুমার বাংলা উচ্চারণে যে দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন তারই অনুসরণে। তৃতীয়টিতে এরূপ কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসৃত হয় নি—'উর্ণতন্তুধৃত', 'শিশিরাশ্রুর', 'ভারতেতিহাসের' প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত উচ্চারণরীতির স্পষ্ট আমেজ আসে, কিন্তু মূলত বাংলা রীতির উচ্চারণের মাঝখানে সেগুলি ঈষৎ বেখাপ্পা মনে হয়। বোধ হয়, লেখক কোন আদর্শ অনুসরণ করবেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না। যেমন, 'অনায়াসলব্ধ অযত্ন-আয়ত্ত সৌকুমার্য' অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। অংশটি স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত রীতিতে পড়া যেতে পারত্ যদি না মাঝখানে 'অযত্ন-আয়ত্ত' শব্দগুচ্ছটি থাকত, যেখানে লেখক সমাস করেছেন কিন্তু সন্ধি করেন নি ; ফলে বাংলা রীতি রাখবার প্রয়াসে ওখানে তিনি ধ্বনি-প্রবাহকে ইচ্ছে করেই

ভেঙেছেন। ব্যাপারটা সম্ভবত সচেতন ইচ্ছার ফল এবং সেই জন্যই কতকটা অস্বাভাবিক ॥

পদ-প্রকৃতির দিক থেকেও তিনটি অংশের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। প্রথম অংশটিতে বিশেষণ বা বিশেষণগুচ্ছের বহুল ব্যবহার একটা বিশেষ ভঙ্গিমা পেয়েছে। Epithet বা বিশেষণের যেমন সুবিধে আছে, তেমনি অসুবিধেও আছে, যদি ঠিক মতো সেগুলিকে ব্যবহার না করা হয়। বিশেষণ বিশেষ্য বা ক্রিয়ার অর্থকে বিশিষ্ট করে দেয়, ফলে বর্ণনা যথাযথ ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 'উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিতে সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া, অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্য-বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।'—কুড়িটি শব্দের এই বাক্যটিতে 'উপন্যাসখানি' এই বিশেষ্য-কর্তা এবং 'ছুটিয়া চলিয়াছে' এই যৌগিক ক্রিয়া ছাড়া বাকি সমস্ত অংশ বিশেষণ, বা ক্রিয়া-বিশেষণগুচ্ছ। 'ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত'—এই অংশে 'ঠিক একটি' বিশেষণগুচ্ছ পাঠককে একাগ্রলক্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত সাদৃশ্যের বোধকে প্রত্যক্ষ করে তুলবার চেষ্টা করছে। 'সরল রেখায়', 'অবিসর্পিত গতিতে', 'সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া' এবং 'অনিবার্যবেগে' এই গুচ্ছ চারটির অর্থ একই, সুতরাং পুনরাবৃত্তির একঘেয়েমি আসতে পারত কিন্তু লেখকের রচনাগুণে তা আসে নি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে একই অর্থকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, সুতরাং সেগুলির মধ্যে যেমন স্বাদের বৈচিত্র্য এসেছে, তেমনি অর্থভঙ্গিমাটি পুষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 'অবশ্যম্ভাবী,' 'বিষাদময়' বিশেষণ দুটি 'পরিণতি'-র দুটি' বিশেষ দিককে ফুটিয়ে তুলেছে (একটু পরে বাক্যদৈর্ঘ্য এবং ছন্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যাই হোক, যেমন এই বাক্যটির মধ্যে তেমনি পরবর্তী বাক্যগুলির ক্ষেত্রেও এক অতি-স্পষ্ট বিশেষণভঙ্গিমা লক্ষ করা যায়। লেখক এখানে যেন একটি বিশেষ্য বা ক্রিয়াকে তার নানা বর্ণ বিচ্ছুরণের মধ্যে অনুভব করতে চান। প্রত্যেকটি বিশেষণ-

গুচ্ছের মধ্যে পাঠককে একটু থেমে এগোতে হয় বলেই 'ছুটিয়া চলিয়াছে', 'কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে', 'রথরজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে' প্রভৃতি অংশের ক্রিয়াপদগুলি এতটা বলিষ্ঠ হতে পেরেছে, ফ্ল্যাট্ বা নিস্তেজ হতে পারে নি।

প্রথম উদাহরণে লেখক যেমন নানা বিশেষণগুচ্ছের মধ্যে বাক্যের অর্থকে ঝুলিয়ে তারপর ক্রিয়াপদের মধ্যে তাকে বলিষ্ঠ সম্পূর্ণতা দিয়েছেন, দ্বিতীয় উদাহরণে ব্যাপারটা তা হয় নি। এখানে লেখক ঘন ঘন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, অসমাপিকা তো বটেই, সমাপিকাও। এতে বাক্যগুলির মধ্যে একটা অস্থির গতিবেগের সঞ্চার হয়েছে। এর বাক্যগুলি প্রথম উদাহরণের তুলনায় সংক্ষিপ্ত এবং সেক্ষেত্রে অন্তত বহুল ক্রিয়াপদের কর্তার জন্য সম পরিমাণে বিশেষ্যও ব্যবহার করতে হয়েছে। ফলে, একটি বাক্যার্থের সমাপ্তি এবং অন্যটির সূচনার মধ্যে ফাঁক যেমন কমে যাচ্ছে, তেমনি পাঠককে দ্রুত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের দিকে ধাবিত হতে হচ্ছে। তাই, প্রথম উদাহরণে যেমন বিশেষণ, দ্বিতীয় উদাহরণে তেমনি ক্রিয়াপদ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় উদাহরণে, যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে, লেখক যেন সযত্নে ক্রিয়াপদ পরিহার করে চলেছেন। কয়েকটি বাক্যেই ক্রিয়াপদ উহ্য, যেখানে আছে সেখানেও সেগুলি নিরপেক্ষ, কেবল ব্যাকরণগত প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। এতে লেখকের চিত্ত সক্রিয়তা-বিহীন, শিথিলভাবে এলায়িত বলেই মনে হয়। কেবল ক্রিয়া নয়, বিশেষ্য বা বিশেষণগুলিও এখানে বিশেষ তাৎপর্য পাচ্ছে না। বরঞ্চ সেই তাৎপর্য পেয়েছে এর সর্বনাম-ভঙ্গিমা, যা বিশেষ রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় গুণ হতে পারে, কিন্তু সম্ভবত এই জাতীয় সমালোচনা-মূলক গদ্যের ক্ষেত্রে নয়। 'এমন একটি অনায়াসলব্ধ অযত্ন-আয়ত্ত সৌকুমার্য', 'স্বপ্নসম্ভূত', 'শক্তির প্রকাশের চেয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্য' এবং 'ও বস্তুটিকে নিয়ে লেখক বেশি নাড়াচাড়া করেন নি' প্রভৃতির

মধ্যে বক্তব্যের প্রত্যক্ষতা নেই, এ সব ক্ষেত্রে লেখকের অভিপ্রেত অর্থ আমরা অনুমান করে নিই। অংশটির মধ্যে তিনি যে সব অলংকার প্রয়োগ করেছেন (পরে দেখুন) তাতেও ঐ একই অনুদ্দিষ্ট সর্বনাম-ভঙ্গিমা প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, কেবল পদ-প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথম উদাহরণে মন্থর অথচ আবেগোত্থ, বলিষ্ঠ গতিবেগ; দ্বিতীয়টিতে আবেগোত্থ কিন্তু অস্থির সক্রিয়তা: তৃতীয়ে অলস, অপ্রত্যক্ষ আবিষ্টতা ফুটে উঠেছে॥

এরপর উদাহরণ তিনটির অর্থচিত্রেব প্রতি লক্ষ করা যাক। প্রথম উদাহরণে লেখক 'কপালকুণ্ডলা'-র 'অনবদ্য গঠনকৌশল'-এর কথা বলতে চেয়েছেন। গঠনকৌশলের মধ্যে যে বিভিন্ন উপাদানের ঐকমুখীনতা প্রত্যাশিত, এই অংশের বাক্যগুলি অভ্রান্তভাবে তারই দিকে ইঙ্গিত করছে। যে দ্বিতীয় বাক্যটি আমরা একটু আগে বিশ্লেষণ করেছি, তার প্রতিটি অংশ (বিশেষণগুচ্ছ) কেন্দ্রীনতা বা সংহতির সূচনা করে। 'কেন্দ্রাভিমুখী' কথাটা লেখকই ব্যবহার করেছেন। পঞ্চম বাক্যটি উদ্ধৃত অংশের দী´তম বাক্য; 'চারিদিকের সমস্ত শক্তি'-র উল্লেখ করে লেখক এখানে বহু তথ্যের সমাবেশ করেছেন, বিশেষ্য-কর্তা রূপে, কেবল তাদের 'এক সঙ্গে ভিড করিয়া যেন রথরজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে' এই পরিণতি দেখাবার জন্য: এখানেও লেখক ঐকমুখীনতার ইঙ্গিত করেছেন। শেষ বাক্যটির অর্থ-দ্যোতনা একই দিকের নির্দেশ করে।

অর্থচিত্রের দিক থেকে প্রথমটিতে যে তথ্য-সমাবেশের ঐক্য ও সংহতি লক্ষ করা যায়, দ্বিতীয়টিতে তা নেই। প্রথমটির লেখক 'কপালকুণ্ডলা' থেকে এমন কতকগুলি তথ্য উপস্থাপিত করেছেন, যা পাঠকেরও চেনা। দ্বিতীয় উদাহরণে লেখক 'কপালকুণ্ডলা' থেকে একটি মাত্র 'সংঘটনা'-র কথা বলেছেন বিশেষ জোর দিয়ে, অন্য সব

ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে (যার মধ্যে লেখকের আত্মপরতাই —subjectivity—প্রধান), এবং তারই সমর্থনে জীবন সম্পর্কে কিছু সাধারণীকরণ করেছেন সামান্য সত্যরূপে উপস্থাপিত করে, যেখানে প্রসঙ্গত তিনি শেক্‌স্‌পীঅরকেও এনেছেন। পুনশ্চ, শেক্‌স্‌পীঅরএর উল্লেখের দ্বারা তিনি এমন একটি অনুষঙ্গ (association) এমনভাবে এনে ফেলেছেন, যাতে তাঁর রচনা বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণমূলক না হয়ে আত্মপর ও আবেগমূলক হয়ে উঠছে। এই জায়গায় লেখার মধ্যে আর তথ্য ও যুক্তির নৈর্ব্যক্তিকতা থাকছে না, লেখকের অনুভূতি ও মানসিকতার রঙে অনুরঞ্জিত হচ্ছে।

তৃতীয় রচনাটি এই অর্থে একেবারেই তথ্যভারমুক্ত, বিশ্লেষণহীন এবং লেখক যে দিকে চান পাঠক নিতান্ত অনিচ্ছুক না হলে সেদিকে চলা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। 'কপালকুণ্ডলা'-র 'অনায়সলব্ধ অযত্ন-আয়ত্ত সৌকুমার্য' বলতে যা বোঝায়, তা বুঝতে না বুঝতে 'স্বপ্নসম্ভূত' বিশেষণটি এসে পড়েছে, যার প্রবণতা মিস্টিফিকেশনের দিকে ; 'স্বপ্নে-পাওয়া দুর্লভ দৈবধন'-এর লক্ষও তাই। এরপর লেখক প্রতিতুলনার আশ্রয় নিচ্ছেন, 'শক্তির প্রকাশের চেয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্যের প্রকাশ বেশি', যদিও 'অনায়াসলব্ধতা'-র সঙ্গে 'নৈপুণ্য'-এর স্পষ্ট বিরোধ আছে। প্রতিতুলনা এরপর 'রাজসিংহ' ও 'সীতারাম'-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে, যেখানে, 'ইতিহাসের দুর্ধর্ষ পাহাড়', 'বিরাট ও শক্তিপুঞ্জ' মূর্তি, 'বাটালির দাগগুলো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ', 'উদ্বেল মাংসপেশী' ['উদ্বেল' কী বোঝায় ?] প্রভৃতি রূপকের এক রাজ্য উপস্থিত করা হয়েছে। এ সবের সঙ্গে 'কপালকুণ্ডলা'-র পার্থক্য কোথায় ?—না, সেটি 'আর এক জাতের শিল্পকলা'। তার পরও আছে, 'ও বস্তুটিকে নিয়ে লেখক বেশি নাড়াচাড়া করেন নি', 'কল্পনার ঊর্ণতন্তুধৃত শিশিরাশ্রু' এবং সব শেষে, 'Magic Hand of chance-এর অপার্থিব কীর্তি'॥

কবিতায় এবং গদ্যে অলংকার-প্রয়োগ ঠিক একই নিয়মে হয় না।

কবিতায় প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখমাত্র করে কবি অপ্রস্তাবিতের জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। বিশেষ কবিতার প্রকৃতি অনুসারে প্রস্তাবিত জগতে তাঁর আর না ফিরলেও চলে। কিন্তু গদ্যে তা হয় না, উপমেয়ের দৃঢ় সমর্থন ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। সেদিক থেকে প্রথম দুটি উদাহরণে অলংকার নেই বললেই চলে। যে দু'একটি রূপক আছে---'প্রেমমন্দাকিনী', 'রথরজ্জুর আকর্ষণ' (১ম), 'উর্ধ্বতম শিখর ও নিম্নতম তলদেশ', 'স্পর্শমণির স্পর্শ' (২য়) প্রভৃতি, সেগুলি এক রকম নিষ্ক্রিয় রূপক (dead metaphor), ভাষার বাচ্যার্থ-নির্ভর সহজ রূপেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু তৃতীয় উদাহরণে লেখক তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন প্রায় সবটাই রূপকের মাধ্যমে, অথচ তৎসম্পৃক্ত উপমেয়গুলি সীমাঙ্কিত হয় নি। আগেকার অনুচ্ছেদে এই রকম অনেকগুলি রূপক উদ্ধৃত হয়েছে, কেবল একটির কথা এখানে উল্লেখ করছি, 'ভারতেতিহাসের দুর্ধর্ষ পাহাড় কুঁদে মূর্তিগুলি তৈরী'· ঔপন্যাসিকের চরিত্র-পরিকল্পনা এবং তার বাণীরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই রূপকের ঠিক অর্থ কী? পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত রূপকগুলির সম্বন্ধে একই প্রশ্ন। প্রকাশের যথাযথতা (precision) যদি গদ্যের ধর্ম হয় (গদ্যে রূপক ব্যবহার করা হয় সেই ধর্মকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য), তাহলে তা এক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে কি না সংশয়ের বিষয়॥

তিনটি রচনার মধ্যে বোধ করি প্রথমটির ছন্দ-সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছন্দ ধ্বনিস্পন্দগত সৌন্দর্য এবং গদ্যের ছন্দ নির্ভর করে অর্থবিস্তারের প্রকৃতির ওপর। একটি বাক্য গড়ে ওঠে কয়েকটি অর্থবিভাগগত বাক্যাংশ নিয়ে এবং একটি অনুচ্ছেদ কয়েকটি বাক্য নিয়ে ; সুতরাং বাক্যাংশগুলির দৈর্ঘ্য ও তাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য, আবার অনুচ্ছেদের মধ্যে বিভিন্ন বাক্যের পরম্পরাযুক্ত সমাবেশ ধ্বনিস্পন্দগত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে থাকে। 'উপন্যাসখানি / ঠিক একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মত / সরল রেখায়, / অবিসর্পিত গতিতে

সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া / অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে / অনিবার্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।'—চিহ্নিত অংশগুলি ধ্বনিস্পন্দগত এক একটি ঢেউ, ওবা মিলিতভাবে একটি দীর্ঘ প্রবাহকে রূপ দিয়েছে। পূর্বোল্লেখিত বিশেষ্য-কর্তা বা বিশেষণগুচ্ছের এক একটি অর্থবিভাগকে অবলম্বন করে এই ঢেউগুলি রূপ পেয়েছে। এই উদাহরণের ছ'টি বাক্যের মধ্যে পঞ্চম বাক্যের দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা বেশি . এখানে ঢেউগুলি এক একটি অর্থবিভাগকে অবলম্বন করে যেন আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। বাক্যগুলি হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ হতে হতে এখানেই দী´তম হয়েছে—অর্থবিস্তার ও ধ্বনিস্পন্দ-সৃষ্টির এটাই হচ্ছে উচ্চতম শিখর। তারপর আর একটি মাত্র নাতি-হ্রস্ব বাক্য যোজনা করে অর্থবিস্তার ও ধ্বনিপ্রবাহকে লেখক একটা নিটোল ঐক্যে রূপবান করেছেন, পদ্যের স্তবকের মতো একটি অনুচ্ছেদকে এখানে তিনি সম্পূর্ণতা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণের বাক্যগঠন ও বাক্যবিন্যাস রীতিতে এইরূপ ছন্দ-সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম তিনটি বাক্যের গঠনে অর্থ-বিস্তার অনুসারে ধ্বনিস্পন্দ-সৃষ্টির চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়, যে রকম আমরা প্রথম উদাহরণে পেয়েছি। কিন্তু তৃতীয় বাক্যটির মধ্যে অর্থগত ও ধ্বনিস্পন্দগত সামঞ্জস্যের অভাবে যেন ভারসাম্য রক্ষিত হয় নি। মনে হয়, 'নিয়ামক হইতে পারে' এই অংশের পর যে একটি ছেদ-চিহ্ন ড্যাস্-এর ব্যবহার আছে, তাতেই অর্থবিস্তার ও ছন্দগত ধ্বনিপ্রবাহ খণ্ডিত হয়েছে এবং সমস্ত বাক্যটি দুটি বাক্যের শিথিল জোড়াতালি হয়ে পড়েছে। যদি প্রথমাংশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমাপক যোগ করে লেখক বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করতেন এবং পরের অংশটিকে পৃথক বাক্য হিসেবে রেখে দিতেন, তাহলে এইরূপ গঠন-শৈথিল্য আসত না। উদাহরণটির পরের বাক্যগুলির মধ্যেও কোনো কোনোটিতে এইরূপ ভারসাম্যের অভাব অনুভব করা যায়। ফলে, সুগঠিত (অর্থগত ও ধ্বনিগত দুদিক থেকেই) বাক্যসমূহের পরম্পরিত

সমাবেশে যে একটি নিটোল অনুচ্ছেদ গড়ে ওঠে, এখানে তা হয় নি।' একটি অনুচ্ছেদের সমাপ্তি বা পূর্ণতা যেন এখানে স্বতই প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে না, একটা অনিশ্চিত আকস্মিকতার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

তৃতীয় উদাহরণে বাক্যাংশগুলির অংশগত অর্থবিভাগ ও ধ্বনি-বিভাগের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে বলতে হবে, যদিও ঢেউগুলির পারম্পর্য সুগ্রথিত নয়। কারণ, বাক্যগুলি আকারে ছোট, কথা বলা হয়েছে কাটাকাটা ভাবে। বাক্যগুলির অর্থচিত্র-নির্মাণের শৈথিল্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। ফলে যদিও অনুচ্ছেদ-রচনার নিয়ম-মাফিক কোনো ত্রুটি নেই, তথাপি যে অর্থবিস্তারগত ও ধ্বনি-প্রবাহ-জাত সংহতিতে কোনো রচনা সজীব অনুচ্ছেদে সংগঠিত হয়, এখানে সেটি লক্ষণীয় হচ্ছে না।

সুতরাং ছন্দ-সৌন্দর্য ও অনুচ্ছেদ-গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, প্রথমটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা, দ্বিতীয়টির গঠন-শৈথিল্য আছে, এবং তৃতীয় রচনাটি নিরপেক্ষতাধর্মী॥

পরিশেষে একটি কথা বলার আছে। আমরা তিন জন লেখকের তিনটি রচনাংশ উদ্ধৃত করেছি এবং সম্পূর্ণভাবে সেই অংশগুলির উপরেই আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে (আমরা বর্তমান গ্রন্থে এই রীতিই অনুসরণ করেছি) ; কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'-বিষয়ক তাঁদের সমগ্র রচনা উদ্ধৃত করলে কোনো বিষয়ে হয়তো আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে হত। বর্তমান আলোচনা ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব লেখকের ; কিন্তু সেই সম্ভাব্য বৃহৎ পরি-প্রেক্ষিতের নয়, কেননা এখানে তা আলোচনার সীমান্তর্ভূত হয় নি।

এখন, আমরা আলোচিত রচনাংশ তিনটির উৎস উল্লেখ করছি :

গল্পের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ

বর্ণনাত্মক গদ্য

১

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু-নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ এক-প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণলতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে; তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে

জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।[১]

রচনাটিতে একটি প্রকৃতিচিত্র ও সেই সঙ্গে লেখকের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তথ্যচিত্র উপস্থাপনার একটা বিশেষ রীতি অবলম্বন করা হয়েছে সেটি পথ-পরিক্রমার সূত্রে বিধৃত। লেখক 'ঝাঁপানে চড়িয়া' অগ্রসর হচ্ছেন আর ছবির পর ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠছে—এই ভাবেই চিত্রগুলি সাজানো হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কীর গান' কবিতার চিত্র-রচনার রীতিতে। এই রীতিটি এখানে এত সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছে যে, চিত্র থেকে লেখক যেখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সরে যাচ্ছেন, সেটি একই পরম্পরাক্রমে (sequence) অবলীলাভরে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন, শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ প্রভৃতি ফুলের উল্লেখ করে লেখক বলছেন, 'এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল।' এখানে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যেন আর একটি চিত্র হয়ে (এবং বর্ণনাটি প্রকৃতই চিত্রধর্মী) দেখা দিচ্ছে।

চিত্রগুলি উপস্থাপনার পিছনে লেখকের একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিও সক্রিয় হয়েছে। তিনি সব কিছুর মধ্যে 'পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন' দেখছেন, সুতরাং উপস্থাপিত চিত্রগুলি পৃথক্‌ভাবে দেখায় প্রায়শই বিরোধী হলেও contrast বা বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে নি, বৈচিত্র্যের দ্যোতনা বহন করে এনেছে। তিনি এমন 'ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষসকল'-এর কথা বলেছেন, যাতে 'একটি পুষ্প কি একটি ফলও

নাই', আবার বলেছেন, 'কেলু-নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ এক প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়,' তাছাড়াও, 'মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে'। সেই রকম, 'যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে'। এ যেন একটা কার্পেটের ওপর নানা বিরোধী রঙের বুনুনি, সব মিলে একটা অখণ্ড প্যাটার্ন্ বুনে তুলছে।

রচনাটিব মধ্যে একটা আপাত অসংগতি আছে: যাঁকে তিনি 'পরম পবিত্র পুরুষ' ও 'নাথ' বলেছেন, তাঁকেই তিনি 'অখিলমাতা' বলে অভিহিত কবেছেন। উভয়েবই স্নেহের কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু বিচিত্রেব মধ্যে এক-কে দেখা যদি তাঁর মানস-দৃষ্টির লক্ষ হয়, তাহলে একই স্নেহের পিতৃসুলভ ও মাতৃসুলভ রূপ দেখাও এখানে প্রত্যাশিত।

যে কোনো বর্ণনাব উৎকর্ষ বোঝা যায় বর্ণনাব প্রত্যক্ষতা ও সজীবতার ওপব। লেখক বস্তুগুলিকে রঙ্ ও রেখা দিয়ে পরিচ্ছিন্ন পেশল মূর্তি দান কবেছেন। 'যানাবোহণ করিলাম' একথা বলেই লেখক ক্ষান্ত হলেন না, যানটিকে বিশিষ্ট করে তুললেন 'ঝাঁপানে চড়িয়া' বলে। পথ-পরিক্রমাও নিস্তরঙ্গ নয়—'অনেক পথ চলিয়া' তারপর 'নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম' এবং তারপরও আছে, 'পর্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে'। দেহী (concrete) রূপ আঁকার বাসনা লেখকের মনকে এমনি অধিকার করেছিল যে 'হরিদ্বর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষসকল'-এর উল্লেখ করেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, কারণ তাতে বর্ণনা নিতান্তই সাধারণ হয়ে পড়ে, পরেই তিনি 'কেলু-নামক বৃহৎ বৃক্ষ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে একটা বিশিষ্ট নাম পাওয়া গেল। 'হরিদ্বর্ণ এক প্রকার কদাকার ফল' বলায় পরও তার কদাকারত্বকে ঘনীভূত করার জন্য লিখলেন, 'তাহা

পক্ষীতেও আহার করে না'। 'কত জাতি পুষ্প' বলে ক্ষান্ত না হয়ে তিনি লিখেছেন, 'শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ' ইত্যাদি। এই সব উদাহরণে রূপ-রচনার যেমন বিশিষ্টতা তেমনি বৈচিত্র্যাভিমুখ প্রসার সূচিত হয়। বিশিষ্ট ও দেহী রূপ আঁকার প্রবণতা সব চেয়ে লক্ষণীয় হয়েছে যেখানে তিনি গুণবাচকতাকে উপস্থিত করেছেন। পুষ্পের মধ্যে ঐশ্বরিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, 'সেই পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল'। তেমনি 'তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না'। 'তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন'—এই বাক্যে অখিলমাতার স্নেহপূর্ণ চোখ এবং তাঁর হাত দুটি পরপর কাজ করে চলেছে এসব কি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না? এখানে আর একটি কথা আছে। এক রূপ থেকে আর এক রূপে সরে যেতে যেতে পাছে পাঠকের মনোযোগ একঘেয়েমির জন্য শিথিল হয়ে পড়ে, সেজন্য কোথাও তিনি প্রতিবিন্যাস-রীতি অবলম্বন করেছেন; চকিত একটু-খানি ঘটনা 'আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে ছিল'-এর উল্লেখ করার পরই তিনি একটি ছবি তুলে ধরলেন, 'এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই'।

পদ-প্রকৃতির দিক থেকে রচনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, বিশেষণ-প্রবণতাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। রূপচিত্রকে বিশিষ্ট এবং পরিচ্ছিন্ন মূর্তি দান করার জন্যই বিশেষণের প্রয়োজন হয়। বিশেষণ পদ বা বিশেষণাত্মক শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে। উপরে দেহী রূপ আঁকার জন্য পরিকল্পিত যে সব বাক্যাংশের উল্লেখ করেছি সেগুলি বিশেষণ-ভঙ্গিমারও উদাহরণ। এখানে আর একটি অংশ উদ্ধৃত

করছি : 'আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে।'—এই বাক্যের বিশেষ্য-কর্তা 'গোলাপ' এবং ক্রিয়া 'করিয়া রাখিয়াছে' ; বাকি শব্দ ও বাক্যাংশ উক্ত বিশেষ্য বা ক্রিয়ার সম্প্রসারক-রূপে কল্পিত। এতে লেখকের প্রসার-অভিমুখ, সৌন্দর্য-ভোগলিপ্সু মানসিকতা ধরা পড়ে।

রচনাটিতে কয়েকটি সুপ্রযুক্ত অলংকার আছে। 'খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে' এই উপমাটি, সাধারণত যা হয়, 'ষ্ট্রবেরি ফলসকল'-কে সুমূর্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে। 'পুষ্প-সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা' প্রভৃতি অংশে যেমন, তেমনি অন্যত্রও, যে অলংকারটি প্রধান হয়ে উঠেছে, সেটি উপচরিত বিশেষণ (transferred epithet), যা রচনাটির মূল কল্পনাভঙ্গির সঙ্গে সমঞ্জসীভূত। 'নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে…' রচনার শেষাংশের এই সম্বোধনমূলক Apostrophe অলংকার বর্ণনাকে সজীব প্রত্যক্ষ করে তোলার একটা কৌশল, যা এককালে লেখকেরা প্রায়ই অবলম্বন করতেন। তাছাড়া, সব শেষে, 'তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না' -এই অংশে যে অতিশয়োক্তি অলংকার আছে, তা লেখকের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম ও গাঢ়তম মুহূর্তটিকেই সূচিত করেছে।

রচনাটিতে বাক্যগুলির দৈর্ঘ্য খুব কম নয়। আবার বাক্যের অন্তর্ভূত ধ্বনিবিভাগগুলিও সাধারণত দীর্ঘ, অন্তত দীর্ঘ বিভাগ রেখে পড়লে তবেই এই বিশেষ রচনার অভিপ্রেত ধ্বনিস্পন্দটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রচনাটি আবেগোত্থ নয়, আবেগের আবেশটাই অনুভূত হয় ; দীর্ঘ বিভাগগুলি তারই দ্যোতক হতে পারে।

অনুচ্ছেদটি আরম্ভ হয়েছে ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে, কিন্তু শেষ হয়েছে

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলে—এদিক থেকে আপাতত মনে হতে পারে অনুচ্ছেদটি ভাবগত ঐক্যে সংহত হয় নি। কিন্তু বিশেষ রচনার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে তার গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির রূপ, লেখকের সক্রিয়তা (ভ্রমণ) এবং তাঁর ঐশ্বরিক উপলব্ধি সবই একই কল্পনাসূত্রে বিধৃত। তাই, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, চিত্রগুলিও যেমন আত্মিক সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা বহন করছে, তেমনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও যেন চিত্রধর্মী হয়েছে। সুতরাং অন্তত বিষয়গত দ্বৈধের জন্য অনুচ্ছেদ-গঠনের ঐক্য বিঘ্নিত হয় নি বলেই বিশ্বাস করি, বরঞ্চ সূক্ষ্ম শিল্পবোধের দ্বারা আপাত-বিরোধের মধ্যেও অন্তরিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, শেক্‌স্‌পীঅরীয় সনেটের শেষ শ্লোকে যেমন বক্তব্যের চরমতা থাকে, বর্তমান অনুচ্ছেদও ভাববিস্তার-ক্রমের ক্রমারোহের পর শেষ দুটি বাক্যের মধ্যে সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করেছে॥

২

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না ; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন ; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব

পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং ?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি; মামনুসর; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।"[১]

উদ্ধৃত অংশের প্রথম অনুচ্ছেদের শুরুতে রয়েছে 'শিখরাসীন মনুষ্য' এবং শেষে তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'এ ব্যক্তি কাপালিক'। কাপালিক—এই কথাটি প্রথমে বলে দেওয়া হয় নি, নবকুমারের দৃষ্টি ও উপলব্ধির মাধ্যমে সেই চিত্রটিকে ক্রমোদ্ঘাটিত ও শেষে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রীতিটি নিশ্চিতভাবে নাটকীয় ও চিত্রধর্মী। অংশটি বর্ণনাত্মক রচনা-কর্মের উচ্চশ্রেণীর উদাহরণ এই জন্য যে, এর প্রত্যেকটি তথ্যচিত্র পাঠকের কাছে বিভিন্ন কৌশলে প্রত্যক্ষ ও সজীব করে তোলা হয়েছে। প্রথমত, কাপালিক-সম্পর্কিত প্রতিটি তথ্যচিত্র খানিকটা

ফাঁক রেখে রেখে বসানো হয়েছে—যেমন, 'নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল' এর খানিকটা পরেই তবে বলা হল, 'বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে'। এর পরে আসবে, 'কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত', কিন্তু সেটি দেখবার সময় পাঠক যাতে বিন্দু-মাত্র অমনোযোগী না হন, সেজন্য আগেই 'পরিধানে কোন কার্পাস-বস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না' একথা বলে তাঁকে উৎসুক করে তোলা হয়েছে। এই ফাঁকগুলো থাকাতে প্রতিটি তথ্যচিত্র আলোকিত ও স্পষ্ট হতে পারছে, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, চিত্রগুলির ফাঁকে ফাঁকে নবকুমারের অনুভূতি-অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে, যেমন, 'নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন', 'আরও সভয়ে দেখিলেন', 'মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন' প্রভৃতি। এতে বর্ণনার প্রতিটি চিত্র একটা রঙ্-রস-গন্ধে নিটোল অবয়ব পাচ্ছে। পাঠকের উপলব্ধি স্বভাবতই নবকুমারকে অনুসরণ করছে বলে তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রিত হতে পারছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম থেকে শুরু করে বাকি অংশে কাপালিকের কিছু ক্রিয়া ও উক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে 'নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না', তারপর জিজ্ঞাসা, 'কস্ত্বং', উত্তর শুনে 'তিষ্ঠ' এই নির্দেশ ও তারপর 'পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল'—এর দ্বারা লেখক কাপালিকের প্রত্যেকটি ক্রিয়া ও উক্তিকে—সেগুলির পারম্পর্যের ধীরতা ও সংক্ষিপ্ততার দ্বারা—বেশ গভীরতা ও গুরুত্ব দিতে পেরেছেন। কাপালিকের মুখে অভ্রান্ত শিল্পবোধের প্রবর্তনায় লেখক যে সংস্কৃত কথা বসিয়েছেন, তার দ্বারাও চরিত্রটির অসাধারণত্ব ও রহস্যময়তা সূচিত হয়েছে।

কেবল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমে 'কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে ধ্যানে মগ্ন ছিল'—এই অংশে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, কারণ, এই সব বিকল্পের দ্বারা পাঠকের মনোযোগকে অহেতুকভাবে বিক্ষিপ্ত করা

হয়েছে, বিশেষ করে আগের অনুচ্ছেদে লেখক যখন বলেই দিয়েছেন, 'নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল'।

লেখক বর্ণনা ও ক্রিয়ার দ্বারা কাপালিক চরিত্রের গম্ভীর রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এখানে আহৃত শব্দগুলির ধ্বনিপ্রকৃতি সেই উদ্দেশ্যের কতখানি সহায়তা করেছে তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। শব্দগুলি আয়তনে বড়, এককভাবে এবং সন্ধি-সমাসের দ্বারাও। শব্দগুলি ধ্বনিমান, তৎসম, মাঝে মাঝে তো আস্ত সংস্কৃত পদই দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই যুক্তবর্ণ ব্যবহার ও ব্যঞ্জনসংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে (যা যুক্তবর্ণ ব্যবহার করলেই স্বতই হয় না)। উচ্চারণ-রীতিটিও লক্ষণীয়। অংশটি বিশুদ্ধ সাধুরীতিতে রচিত এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ বজায় রেখে স্বর ও ব্যঞ্জন স্পষ্ট উচ্চারিত। অর্থাৎ শব্দ-প্রকৃতি ও উচ্চারণ-রীতির দ্বারাই লেখক তাঁর অভিপ্রেত গাম্ভীর্যের দ্যোতনা আনতে পেরেছেন।

লেখক অন্য উপায়েও সেই ভাব এবং তার পরিপোষক অন্য ভঙ্গিকেও সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। অংশটির অধিকাংশ ক্রিয়াপদই যৌগিক—'দেখিতে পাইল', 'আসিতে পারিয়াছিলেন, 'পাইতে লাগিলেন', 'করিতে পারিলেন' ইত্যাদি। এ সবের দ্বারা বাক্য-সমাপ্তির বলিষ্ঠতা যেমন বোঝায়, তেমনি পূর্বোক্ত বড় আয়তনের শব্দ-গুলির সঙ্গেও একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এতে অর্থবিস্তারের একটা প্রসরণশীল ভঙ্গিও সূচিত করে, যা অন্যভাবেও সিদ্ধ হয়েছে। পাঠক লক্ষ করবেন, অংশটিতে বিশেষ্য-কর্তার যেমন সম্প্রসারক, তেমনি ক্রিয়াপদের জন্য ক্রিয়াবিশেষণগুচ্ছ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে —'শিখরাসীন মনুষ্য', 'মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত', 'নয়ন মুদ্রিত করিয়া', 'চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে', 'অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া' প্রভৃতি সেসবের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। এসবের দ্বারা লেখকের মানসিকতার প্রসার-ভঙ্গিই লক্ষ করা যায়।

উদ্ধৃত অংশে ছন্দগত চলাটাও সুপরিচ্ছিন্ন, বিদ্যাসাগর-সুলভ

পর্যাপ্ত ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার করে লেখক ধ্বনিবিভাগ ও অর্থবিভাগকে সমপাতী ও স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'শিখরাসীন মনুষ্য।' নয়ন মুদ্রিত করিয়া। ধ্যান করিতেছিল'—এইরূপ যে কোনো বাক্য তুলে নিলেই বিভাগগুলি অনুসরণ করতে অসুবিধে হয় না। বাক্যগুলিও নাতি ক্ষুদ্র, নাতি বৃহৎ। ফলে অর্থবিস্তারের মন্থর, গম্ভীর ভঙ্গি ধ্বনি-প্রবাহের সঙ্গে সমঞ্জসীভূত হয়ে রচনাটিকে সুপরিচ্ছিন্ন নিটোলত্ব দান করেছে।

প্রবন্ধ-রচনা এবং আখ্যান-বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-গঠন একই রীতিতে হয় না, এখানেও হয় নি। 'শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া······বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।'—এই অংশটি উভয় রীতির মানদণ্ডেই একটি সুগঠিত অনুচ্ছেদ হয়েছে: নবকুমারের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত নির্মীয়মান কাপালিক চরিত্র-চিত্রের ঐকমুখীনতায়। কিন্তু উদ্ধৃত বাকি অংশটিতে যদিও দৃশ্যত অনেকগুলি তথাকথিত অনুচ্ছেদ রয়েছে (কথোপকথন আছে বলে), তবু সেগুলিকে একত্রে একটি মাত্র অনুচ্ছেদরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন। কারণ, আখ্যান-বর্ণনা যে অগ্রসর হচ্ছে, এই সমগ্র অংশটি জুড়ে নবকুমার সম্পর্কে কাপালিকের সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে তার একটি আইডিয়া বা ভাব-গ্রন্থি রূপ পেয়েছে। সুতরাং সমগ্রভাবে এই অংশে একটি একক অনুচ্ছেদের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে॥

৩

শশিভূষণ যেমন বয়সে বড় তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই তিনি পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ঐ গ্রামের জমিদারের সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের

একটি কর্ম পাইয়াছিলেন। জমিদারের সরকারে কার্যের বেতন নামমাত্র। বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কর্ম করিতে অসম্মত হন না। ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠিলেন।

শশিভূষণের চাকরি ও বিধুভূষণের বিদ্যারম্ভ এক সময়েই হইয়াছিল। ভালবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না। হয়, যে তোমাকে ভালবাসে তুমি তাহাকে ভালবাসিবে, নতুবা, তাহাকে ঘৃণা করিবে। অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ প্রতিশোধ আছে, কিন্তু ভালবাসার প্রতিশোধ এই দুইটি মাত্র। এ দুয়ের মাঝামাঝি আর কিছুই নাই। বিধুভূষণের মাতা বিধুকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেন, মা সরস্বতীও যে, তাঁহার উপর কুপিত ছিলেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রথম প্রথম অনেকেই বলিয়াছিল, বিধু ভাল লেখাপড়া শিখিবে, কিন্তু শিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। বিধুভূষণ পার্থিব মাতার ভালবাসা, ভালবাসার দ্বারা পরিশোধ করিতেন, কিন্তু মা সরস্বতীর যে কিঞ্চিৎ ভালবাসা ছিল, তাহা ঘৃণার দ্বারা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সমর উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রথমতঃ গুরুমহাশয় পরে প্রতিবাসিবর্গ একে একে সকলেই বিধুভূষণের সহিত মা সরস্বতীর সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বিধুভূষণকে যতই তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন, বিধুর ততই আমোদ প্রমোদে অনুরক্তি ও বিদ্যাভ্যাসে বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। মূর্খতাবশতঃ কখনও কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না। এজন্য ১৫ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর বউও ঘরে এলেন, এদিকে মা সরস্বতীও চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন।

বিধুর বিবাহের পর তাঁহার মাতা পাঁচ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শশিভূষণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ও বিধুভূষণের একটি ছেলের জন্ম ভিন্ন, এ স্থানে উল্লেখের যোগ্য আর কোন ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই। এজন্য আমরা এইখানেই এ অধ্যায়ের শেষ করিলাম।[১]

লেখক এখানে কাহিনী রচনার প্রয়োজনে ঘটনা-পরম্পরা বর্ণনা করছেন। এ ব্যাপারে প্রথমেই লক্ষণীয় হচ্ছে লেখকের এ্যাটিচ্যুড্, অর্থাৎ বর্ণনীয় কাহিনীর প্রতি তাঁর অবলম্বিত মনোভাব। স্পষ্টত, সেটি সচরাচর অবলম্বিত রীতির নয়। মনে হয়, তিনি ইচ্ছাপূর্বক প্রচলিত কাহিনী বলার রীতিকে যেন ব্যঙ্গ করছেন, অথচ ঘটনা বর্ণনা তাঁকে করতেই হবে। তাই আপাত-নিরীহ অথচ সকৌতুক একটা ভঙ্গি তিনি অবলম্বন করেছেন। বস্তুত ঘটনা-বর্ণনার অন্তরালে লেখকের একটি কৌতুক-উজ্জ্বল মুখভাব আভাসিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, তিনি একটি করে ঘটনার টুকরো উপস্থিত করছেন আর তাতে একটি করে টিপ্পনী যোগ করছেন। সেই প্রয়াসে কাহিনী-বহির্ভূত বিষয়ান্তরেও তিনি চকিত আলোকপাত করে আবার মূলে ফিরে আসছেন। এর ফলে ঘটনাগুলি অর্থ বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ সজীবতা লাভ করছে। এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে সামান্যের বিবৃতি ও বিশেষের উপস্থাপনা—এই কৌশলটি তাঁকে লক্ষে পৌঁছতে বিশেষ সাহায্য করেছে। 'বোধ হয়, বেতন না থাকিলেও অনেকে জমিদারের সরকারে কর্ম করিতে অসম্মত হন না'—মৃদু ব্যঙ্গ-খচিত এই সামান্যের বিবৃতির পরই তিনি যখন লিখলেন, 'ফলতঃ শশিভূষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল', তখন তাঁর বক্তব্যটি শুধু প্রতিষ্ঠিত হল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তির্যক অর্থদ্যোতনায় সেটি শাণিত হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে তিনি সেই রকম একটি সামান্য সত্য গড়ে তুললেন, 'ভালবাসা কখনই অপ্রতিশোধিত থাকে না' এবং সেই বিবৃতিটিকে আরো তিনটি বাক্যের দ্বারা বিশদ করলেন। তারপরই তিনি বিশেষ ঘটনার কথা আনছেন: বিধুভূষণ তাঁর পার্থিব মা-কে ভালোবাসতেন আর মা সরস্বতীকে ঘৃণা করতেন, উভয়ই ভালোবাসার প্রতিশোধ হিসেবে। আবার বলা দরকার, সমস্ত ব্যাপারটা নিষ্পন্ন হয়েছে একটা কৌতুক-উদ্ভাসিত মনোভাবের পটভূমিতে। এর ফল হচ্ছে এই যে, বিধুভূষণের লেখাপড়া না শেখাঃ

এবং আমোদ-প্রমোদে অনুরক্তি, এমন এক অনিবার্য, স্বাভাবিক প্রত্যক্ষতায় পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয় যে এ সম্বন্ধে কোনো সম্ভাব্য প্রশ্ন বা সংশয় তিনি অনুভব করেন না। ঘটনাটা তাঁর মনে স্বতসিদ্ধের মতো আঁকা হয়ে যায়। তারপর আবার লেখক একটি কৌতুকোদ্ভাসিত সামান্য সত্য গড়ে তুলছেন, 'মূর্খতাবশতঃ কখনও কুলীনের বিবাহ বন্ধ থাকে না'-- কেবল 'এজন্য ১৫ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল' এই বিশেষ ঘটনাটিকে প্রশ্নাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের কৌশলটি একটু ভিন্নতর। লেখক অপেক্ষাকৃত গৌণ ঘটনার ফ্রেম রচনা করে মূল ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। বলছেন যে, বিধুভূষণের বিবাহের পর তাঁর মা পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, আর, সেই সময়ের মধ্যে 'শশিভূষণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ও বিধুভূষণের একটি ছেলের জন্ম ভিন্ন, আর কোনো ঘটনা ঘটেনি।' বস্তুত, লেখকের আপাত-নিরীহ, সরল রচনার পিছনে আঙ্গিক-গত সচেতন প্রয়াস যথেষ্টই লক্ষ করা যায়। আর বর্ণনাত্মক গদ্যের উদ্দেশ্য যদি ঘটনাকে সজীব করে তোলা এবং পাঠকের প্রতীতি উৎপাদন করা হয়, তাহলে এব্যাপারে লেখক নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয়েছেন।

অংশটির গদ্য-রচনা সাধু, না কথ্য রীতির? একটা ভঙ্গি আছে: প্রথার খাতিরে গুরুজনের কাছে মাথা নত করছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফুটে উঠছে কৌতুকের হাসি। এও তেমনি। প্রচলিত কাহিনী বর্ণনার সাধু রীতির ঠাট লেখক বজায় রেখেছেন—সাধু ভাষার ক্রিয়া পদ ব্যবহারে এবং 'তদীয়', 'বয়ঃক্রমকালেই', 'বিলক্ষণ প্রাপ্তি', 'সঙ্গতিপন্ন লোক', 'বিদ্যারম্ভ', 'অপ্রতিশোধিত' প্রভৃতি সাধুরীতিসুলভ তৎসম শব্দ ব্যবহারের দ্বারা। কিন্তু শব্দগুলিকে তিনি ব্যবহার করেছেন কতকটা কৌতুক করার ভঙ্গিতে—যেন হঠাৎ চিমটি কাটা বা অলক্ষে চুল ধরে টেনে দেবার মতো। বালক বিধুভূষণ ও তার

'বউ'এর ক্ষেত্রে তিনি যে সম্মানবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, তার দ্বারাও সেটি বোঝা যায়। নইলে সমস্ত রচনার বাক্‌ভঙ্গি কথ্য রীতিকেই অনুসরণ করেছে। সংস্কৃত রীতিতে (প্রয়োজনে স্বর-গুলিকে দীর্ঘ ও ব্যঞ্জনগুলিকে স্পষ্ট করে) উচ্চারণও সাধিত হয় নি। কথ্যভঙ্গির ধর্মই হচ্ছে ভাষা-প্রবাহকে একটা বলিষ্ঠ, সাবলীল রূপ দেওয়া। লেখক বাক্যগুলির শেষে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, সেগুলির ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে, কেবল ব্যাকরণগত প্রয়োজনেই সেগুলির প্রয়োগ করা হয় নি।

উদ্ধৃত অংশে প্রচলিত অলংকারের ব্যবহার নেই। 'মা সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সমর উপস্থিত হইল'—এই রকম এক আধটি জায়গায় যে রূপক আছে তা কৌতুক সৃষ্টির জন্য কল্পিত। তাছাড়া, সেগুলি নিষ্ক্রিয় রূপকের নমুনা, যা সহজ ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু লেখক এখানে কিছু আলংকারিক উপায়ও অবলম্বন করেছেন। বাক্য-গঠনে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সংহতি সৃষ্টি ('শশিভূষণের চাকরি ও বিধুভূষণের বিদ্যারম্ভ এক সময়েই হইয়াছিল'), পার্শ্ববিন্যাস বা বিপরীত-বিন্যাস ('বিবাহের পরে বউও ঘরে এলেন, এদিকে মা সরস্বতীও চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন') প্রভৃতি সেগুলির মধ্যে প্রধান।

অংশটিতে বাক্যের গঠন, বিন্যাস ও অনুচ্ছেদ-নির্মাণের ক্ষেত্রেও সহজ সৌন্দর্য বিদ্যমান। বাক্যের অন্তর্ভূত বাক্যাংশগত অর্থযতি ও ধ্বনিযতি সমপাতীও স্পষ্ট, কিন্তু সেগুলি স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো প্রয়াসের চিহ্ন নেই। বাক্য-দৈর্ঘ্যও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অর্থবিস্তারের তৎস্থানিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হ্রস্ব-দীর্ঘ হয়েছে। বর্ণনার বিষয়-নির্ভর বিভাগ অনুসারে অনুচ্ছেদগুলিও সুপরিচ্ছিন্ন—প্রথম অনুচ্ছেদে শশিভূষণের কর্মপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়ে বিধুভূষণের বিদ্যাসমাপ্তি ও বিবাহ এবং শেষটিতে দুই ভাইয়ের মাতার মৃত্যু ও সন্তানাদি লাভের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা উচিত, এই জাতীয় বর্ণনামূলক রচনার

অনুচ্ছেদ ভাবের উত্তাপ ও ঐক্যানুসারে সংহত হয় না, ঘটনা-পরম্পরার বিভাগ অনুসারে সজ্জিত হয়। এখানে সেই রীতিতেই অনুচ্ছেদগুলি গঠিত হয়েছে ॥

৪

সিদ্ধার্থ বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখলো ওদের বাড়ির সামনে একটা মোটর গাড়ি থেমে আছে। সামনে ড্রাইভার, পিছনের সীটে এক ভদ্রমহিলা। ড্রাইভার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—এ-গলির শেষ বাড়ি সিদ্ধার্থদের। ওকে জিজ্ঞেস করলো, পঁচিশের এক? পঁচিশের এক, কালিপ্রসাদ চৌধুরী, কোন্ বাড়িটা?

সিদ্ধার্থ একটু ভুরু কুঁচকে বললো, এই বাড়ি—

ড্রাইভার নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল। ভদ্রমহিলা নামলেন। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মাঝামাঝি কোথাও বয়েস, ফরশা মুখে সোনার চশমা, বেশ ব্যক্তিত্বময়ী। স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ক'রে তিনি বললেন, আমি কালিপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তিনি বাড়ি আছেন?

ছোটোকাকার সঙ্গে এ-রকম কোনো মহিলা আগে কোনোদিন দেখা করতে আসেনি। সিদ্ধার্থ কিছুটা অবাক হয়। দরজা খুলে দিয়ে বলে, আসুন, ভেতরে আসুন।

দরজার পরেই বারান্দা, বারান্দার একপাশে টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার পাতা, বাইরের কেউ এলে এখানেই বসতে হয়। চেয়ারের ওপর থেকে দোমড়ানো খবরের কাগজ সরিয়ে সিদ্ধার্থ বললো, আপনি একটু বসুন, আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।

সেই মুহূর্তে ছোটোকাকার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না সিদ্ধার্থর। ভেতরে ঢুকে ডাকলো, টুনু! টুনু!

সাড়া নেই, টুনু বাড়ি নেই। মা মেঝেতে চাল ছড়িয়ে কাঁকর বাছছেন। এর মধ্যে কোনো-এক ফাঁকে তিনি জানালা দিয়ে ভদ্রমহিলাকে

দেখে নিয়েছেন নিশ্চয়ই, কেননা, সিদ্ধার্থকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে রে? কোত্থেকে এসেছে?

সিদ্ধার্থ হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলো, আমি তা কী ক'রে জানবো? আমার কাছে এসেছে না কি?

—নাম জিজ্ঞেস করিসনি?

—কোনো ভদ্রমহিলা বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই তার নাম জিজ্ঞেস করা যায় না কি? ছোটোকাকা কোথায়?

মার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। সিদ্ধার্থ আজকাল প্রায় মায়ের সঙ্গে চোটপাট ক'রে কথা বলে অকারণে। বিমর্ষভাবে বললেন, ছাখ, পাশের ঘরে বোধ হয়।

পাশের ঘরেও ছোটোকাকা নেই। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল জুড়ে একটা কালো শাড়ি শুকোচ্ছে। সুতপার শাড়ি। সুতপা তো দুপুর থেকেই বাড়ি নেই।

বাথরুমের দরজা বন্ধ। সিদ্ধার্থ বাথরুমের সামনে বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, ছোটোকাকা, আপনাকে এক জন ডাকতে এসেছেন। এক ভদ্রমহিলা।

—কে? ভেতর থেকে একটা বিস্মিত গম্ভীর গলা ভেসে এল।

—নাম জানি না। এক ভদ্রমহিলা। গাড়ি ক'রে এসেছেন।

—ভদ্রমহিলা? একা এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—বসতে বল। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি!

সিদ্ধার্থ আবার বারান্দায় ফিরে এলো। ভদ্রমহিলা চেয়ারে সোজা হয়ে ব'সে আছেন রাশভারিভাবে। সিদ্ধার্থ বললো, একটু বসুন, উনি এক্ষুনি আসছেন![১]

এও বর্ণনাত্মক গদ্যের উদাহরণ, কিন্তু আমরা আগেই যে উদাহরণ গুলি গ্রহণ করেছি, তাদের থেকে একশো বছরেরও বেশি ব্যবধানে

রচিত। সুতরাং বর্ণনার রূপ ও রীতি, যুগের প্রয়োজনে অনেকখানি বদ্‌লে গেছে।

গ্রন্থমুখের বর্ণনা যখন, তখন নায়ককেই লেখক এখানে উপস্থিত করেছেন —সিদ্ধার্থ। 'সিদ্ধার্থ' এই নামটির ধ্বনিরূপ এবং প্রত্যাশিত চারিত্রিক অর্থরূপ সম্বন্ধে পাঠককে একটু সতর্ক হতে হবে। বলছি, কিন্তু তার আগে আরো লক্ষ করুন, ড্রাইভার ও গাড়ি, ভদ্রমহিলা—বেশ ব্যক্তিত্বময়ী, কালিপ্রসাদ চৌধুরী, মা (অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধ) ও সুতপা —এগুলি এই ছোট্ট অংশের নাম, প্রস্তাবিত চরিত্রসংঘ। পূর্বতন উপন্যাসে এই অভিধাগুলো যা করতে পারত, এখানে পাঠকের মনে ঠিক সেই প্রত্যাশিত, সম্ভ্রমপূর্ণ আবেগ জাগাচ্ছে না—এদের উক্তি, কাজ, মনোভঙ্গি (attitude) প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত পরিস্থিতিটা গায়ে-না-লাগা, নিস্পৃহ (casual), হাল্কা সুতরাং ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠছে। স্পষ্টত, লেখক এখানে জীবন-সমবায়ের এমন একটা টুকরো চিত্র তুলে ধরতে চাইছেন, যার ওপরের ঠাট বজায় আছে, কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা।

লেখকের বর্ণনারীতি বেশ নাটকীয়, তুদিক থেকে। ক্রমে ক্রমে অথচ নিশ্চিতভাবে তিনি পরিস্থিতিটাকে উন্মোচিত এবং নাট্যোপযোগী বৈপরীত্য (contrast) দানও করেছেন। কিন্তু ঠিক আবার রীতি-মাফিক নাটকীয়তাও নয়, যাতে চরিত্র ও ঘটনাকেই উন্মোচিত করা হয়। এ বিষয়ে একটু পরেই ফিরে আসছি।

আগেই বলা হয়েছে, লেখক সমস্ত পরিস্থিতিকে (আর মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতিকেই তিনি সম্মুখে রেখেছেন) দেখছেন আপাত-নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গিতে, যদিও ভেতরে রয়েছে তাঁর স্থির লক্ষ। এ ব্যাপারে বারেবারেই তিনি মৃতু আকস্মিকতার ধাক্কা দিয়েছেন। 'সিদ্ধার্থ বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছিল' যেমন অনেক কিছুর মধ্যে সামান্যতম একটা ঘটনা, তেমনি বাড়ির সামনে থেমে থাকা একটা মোটর গাড়ি। 'সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে বললো, এই বাড়ি—' সিদ্ধার্থের

মনের ভাব লেখক বলে দিলেন না ; পাঠক অনুমান করুন, সেটা হতে পারে বিরক্তির, হলেও-হবে-বা ভাবের, হয়তো একটু বিস্ময়ের—অবশ্য এমন বিস্ময়, যাতে কিছু এসে যায় না। শেষে '—' ড্যাশ চিহ্নটি এ বিষয়ে ইঙ্গিতময়।

যদিও থেমে থাকা গাড়ি, ড্রাইভার, ভদ্রমহিলা—বেশ ব্যক্তিত্বময়ী এবং 'ফরশা মুখে সোনার চশমা'— তথাপি সিদ্ধার্থ যে ভাবে 'আসুন, ভেতরে আসুন' বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল, তাতে কোনো আবেগ নেই, প্রত্যাশা নেই, আছে কিছু-একটা-হবে ভাব। আগেকার যুগের উপন্যাসে এটা বেশ আলোড়ন তুলত।

ছোটখাটো ডিটেল্‌সের কাজে লেখক বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন : 'দরজার পরেই বারান্দা, বারান্দার একপাশে টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার পাতা, বাইরের কেউ এলে এখানেই বসতে হয়। চেয়ারের ওপর থেকে দোমড়ানো খবরের কাগজ সরিয়ে···' এই শেষের তথ্যটি চমৎকার শ্লেষাত্মক ; যেখানে যেটি থাকার সেখানে সেটি নেই : জীবনটাই এমনি অগোছালো, অপবিন্যস্ত (misplaced)। এরই সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন, টুনুকে ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না, ছোটকাকা কোথায় সে সম্বন্ধে কারুর জানা নেই, ঔৎসুক্যও নেই।

নেই কোনো জিনিসই তার ঠিক জায়গায়, ঠিক রূপে। যেমন, মা (মা বলতে বেশ একটা সমৃদ্ধ অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয় না কি ?)—'মা মেঝেতে চাল ছড়িয়ে কাঁকর বাছছেন' (পাত্রে নয়), 'ছোটোকাকা' 'কালিপ্রসাদ চৌধুরী' (নামটা বেশ জমকালো—তারাশঙ্করের জমিদারদের একজন ?) কোথায় আছেন ? —কোনো রোমান্টিক মর্যাদার মধ্যে নয়, বাথরুমের মধ্যে (পাঠক লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই আধুনিক কথাসাহিত্যে 'বাথরুম' বারবার ফিরে ফিরে আসে)! জানালা দিয়ে আগন্তুক ভদ্রমহিলাকে দেখার পরও মায়ের প্রশ্ন, 'কে রে ? কোত্থেকে এসেছে ?' এবং সব শোনার পর কালিপ্রসাদ চৌধুরীর ব্যগ্র জিজ্ঞাসা, 'ভদ্রমহিলা ? একা এসেছেন ?'—সবটাই

এমন একটা নিম্ন স্তরের তুচ্ছ মানসিকতা ফুটিয়ে তোলে, যা পাঠকের মনে জুগুপ্সা সৃষ্টি করতে বাধ্য। এই ব্যাপারে—ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিস নেই—ক্লাইম্যাক্স বোধ হয়, সুতপার দুপুর থেকে বাড়ি না থাকা এবং 'এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল জুড়ে একটা কালো শাড়ি শুকোচ্ছে। সুতপার শাড়ি।' পাঠক এটাকে সিম্বলিক মনে করবেন ? সব মুছে আড়াল হয়ে কালো হয়ে গেছে।

লেখক যে বর্ণনা করছেন তার আপাত সহজতা ও স্বাভাবিকতার কোনো ব্যত্যয় নেই। কিন্তু টুকিটাকি কথা, ছোটখাট ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে বোঝাচ্ছেন কোনো মানুষই কারো সঙ্গে মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না। যে ভাবে সিদ্ধার্থ আগন্তুক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেছে (বলতে বাধ্য হয়েছে), ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে ; 'আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি' বলার পরও বোঝানো হয়েছে 'সেই মুহূর্তে ছোটো-কাকার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না সিদ্ধার্থর' ; যেভাবে 'সিদ্ধার্থ আজকাল প্রায়ই মায়ের সঙ্গে চোটপাট ক'রে কথা বলে', ছোট কাকা কোথায় এ প্রশ্নের উত্তরে মায়ের যে উদাসীন উক্তি 'পাশের ঘরে বোধ হয়'—তাতে বোঝা যাচ্ছে প্রতিটি মানুষ অপরকে এড়িয়ে চলতে চায়। প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক—বিচ্ছিন্ন। আর প্রত্যেকেই সে সম্বন্ধে সচেতন। এর চরম রূপটি বোধ হয় লেখক এঁকেছেন, এ বাড়িতে তাঁর কিরূপ অভ্যর্থনা হয়েছে সেটা জেনেও আগন্তুক 'ভদ্রমহিলা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছেন রাশভারিভাবে' এই কথা বলে। ফুটো আত্মকেন্দ্রিকতার এই ছবিটি অপূর্ব—আর সে ছবির প্রতিচ্ছায়া পড়েছে সব ক'টি চরিত্রেই।

এ হচ্ছে পূর্বতন ঔপন্যাসিক আদর্শের ঘটনা ও চরিত্র-বিন্যাসের শ্লেষাত্মক ভগ্নচ্ছায়া—কলকাতার ঊর্ধ্বশ্বাস গতির মাঝখানে ট্রাফিক বন্ধ হয়ে গেলে যে মানসিকতায় বিষ্ণু দে'র মনে পড়েছিল, 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর'[১]—এও হচ্ছে কতকটা সেই রকম।

অংশটির শব্দ-সমাবেশ, পদ-প্রকৃতি, বাক্য-গঠন প্রভৃতির দিকে লক্ষ করলে কয়েকটি জিনিস চোখে পড়ে। লেখক শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত মিতাচারী, তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে সেই প্রয়াসটা চোখে পড়ে না। অল্প কথা ব্যবহার করেই তিনি পরিস্থিতিটাকে বেশ এগিয়ে দিতে পারেন, পাঠক এ ব্যাপারে প্রথম বাক্যটিই লক্ষ করুন। আরও, 'ড্রাইভার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—এ গলির শেষ বাড়ি সিদ্ধার্থদের' —এটা কি একটা বাক্য? ব্যাকরণের বিচারে এটা দুই অর্থগত বিষয়ে দুই বাক্য; কিন্তু পাঠক একটা ধাক্কা (jolt) খেয়ে উপলব্ধি করেন, এদিক-ওদিক তাকানোর লক্ষ সিদ্ধার্থদের বাড়ির খোঁজ পাওয়া।

আজকাল প্রায় গল্পে-উপন্যাসে চরিত্রের উক্তি উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয় না। স্থান বিশেষে তা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু এখানে লেখকের বর্ণনা ও চরিত্রের উক্তি প্রায় একই সঙ্গে মিশে গিয়ে বেশ খানিকটা সংহতি-বোধের সৃষ্টি করেছে, 'ওকে জিজ্ঞেস করলো, পঁচিশের এক? পঁচিশের এক, কালিপ্রসাদ চৌধুরী, কোন্ বাড়িটা?'

লক্ষণীয় যে লেখক এই অংশটিতে অন্তত কোনো অলংকার ব্যবহার করেন নি; সম্ভবত তাঁর নিস্পৃহ (ক্যাজুয়াল) দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক বর্ণনায় নিস্তরঙ্গতা সৃষ্টির জন্য। এমন কি এক-আধটা ছাড়া তিনি অর্থবহ বিশেষণও এড়িয়ে গেছেন, বোধ হয় ঐ একই কারণে। কেবল অপ্রয়োজনে তিনি এক জায়গায় একটা ক্রিয়া-বিশেষণ প্রয়োগ করে ফেলেছেন। 'মার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো' এটা বলার কিছু পরেই আছে, 'বিমর্ষভাবে বললেন'—এখানে শুধু 'বললেন' যথেষ্ট হত, 'বিমর্ষভাবে' 'ম্লান ছায়া'-কে বদলে দেয়, পাঠকের মনোযোগ এতে অহেতুক নাড়া খায়।

লক্ষ করতে হবে, উদ্ধৃত অংশে ক্রিয়াপদগুলি বিশেষ বলিষ্ঠ নয়, কেবল ব্যাকরণগত প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, নয়তো লেখক পরিহার

করতেই চেয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা'-র বর্ণনায় আমরা বিপরীত দৃশ্য দেখেছিলাম। যেখানে ঔপন্যাসিকতা বা নাটকীয়তা (আধুনিক রীতিতে) থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন আদর্শের বলিষ্ঠ চরিত্র ও ক্রিয়ার অভাব, সেখানে বোধ হয় এটাই স্বাভাবিক।

সমস্ত অংশটির মধ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবৃত্তি আছে। যাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে সমস্ত পরিস্থিতিটা রূপ পেয়েছে, সিদ্ধার্থের চোখে তিনি কেবলই 'ভদ্রমহিলা' - তাঁকে দেখেও মনে হয়েছে 'ভদ্রমহিলা', সে মা ও ছোটকাকার কাছেও তাঁর উল্লেখ করছে 'ভদ্রমহিলা' বলে। তাঁর কাছে বা অন্যত্র তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো ইণ্টারেস্টই তার মনে জাগে নি। তাঁকে কয়েক বারই তাকে কিছু বলতে হয়েছে, কিন্তু তা কেবল 'বসুন' বা তার সঙ্গে একটা-আধটা প্রাসঙ্গিক কথা। এই হচ্ছে লেখকের অঙ্কিত এখনকার মানবিক সম্পর্কের ছবি : আজকাল যে কোনো মানুষ নিজে এবং তার চোখে অন্যে এই রকম অন্তরিত (ইনস্যুলেটেড্) হয়ে গেছে॥

অনুশীলনীর জন্য

ক

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল করে করলে অভীককুমার। তাছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটেবাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শত হস্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে 'গোলা খা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগ-দম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন-কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারী ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্যে পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।[১]

খ

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড় আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোট ভাই-বোনকে কোলে করে, কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্রনগরের রাজপুত রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই—ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে—"ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?" বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন—"না, যাব না।" হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনীদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটিমাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝিঁর ঝিনিঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে শোনা ভীল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোট একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল! আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিম দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো-কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে, সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণ-ছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত—তাদের কি সুন্দর রঙ, কি সুন্দর খেলা! বাপ্পা সজল

নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন —বাঁশির করুণ স্বর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।[১]

গ

দলটা খুব বড়ো নয়, জন ত্রিশ-বত্রিশ লোক—তাহার মধ্যে জন দুয়েক ভারবাহী, একজন চাকর, একজন পাচক, বাকি সাতাশ-আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে—ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহারা উত্তর মুখে চলিয়াছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারাই জানে। পথে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম-প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। নিকটেই একটা বড়ো পুকুর। বেলাও তখন দু-প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। একজন রক্তচক্ষু দন্তুর প্রৌঢ় ভারবাহী দুইজনকে ও চাকরটিকে লইয়া স্থানটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উনান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভারবাহীদের ভারের বোঝা খুলিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল—একটা অ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, একখানা কড়াই, তারপর একটা টিনের মগ—একটার পর একটা বাজিকরের ঝুলির ভিতরের ছোটখাট নানা টুকি-টাকির মতো। বাকি সকলে পুকুরে মুখ-হাত ও হাঁটু পর্যন্ত পথের ধূলা ধুইয়া আসিয়া বটগাছের ছায়াতলে খানকয়েক পুরানো মাদুর ও চট বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে জনকয়েক গামছা বিছাইয়া বসিল। দলের মধ্যে গুটিছয়েক ছেলে, তাহারাই শুধু যেন এখনও ক্লান্ত নয়; শীর্ণ শরীর, তাহার উপর মুখ শুকাইয়া গেছে,—তবু তাহারা স্থানটা আবিষ্কারের জন্য চঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া নূতন কিছু খুঁজিতে ছিল। চোখে চোখে ইশারাও চলিতেছে, ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে দুটি ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়াও চলিতেছে।

রক্তচক্ষু দস্তুর প্রৌঢ় বলিল, পশুপতি শুয়ে পড়লে যে! ওঠ, একবার তামুক খাও, খেয়ে ভারী দুজনকে নিয়ে একবার বাজারে যাও, জিনিসপত্র যা নাই—তা কিনে দিয়ে এসো, বলি রমণ, তোমার নাসিকা যে গর্জন করছে মাঝে মাঝে! ওঠ, উঠে আলুগুলো কুটে ফেল।

রক্তচক্ষু প্রৌঢ়ই দলের ম্যানেজার। কংস, আয়ান ঘোষ, ভীম বা যে কোনো রাজার ভূমিকায় সে অভিনয় করিয়া থাকে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা উগ্রতা এবং রুক্ষতা আছে, একটা গাম্ভীর্যও আছে—দেখিয়া মনে ভয় হয়। পশুপতি উঠি উঠি করিয়াও মধ্যে মধ্যে চোখ বুজিতেছিল; ম্যানেজার বেশ একটু গম্ভীর ভাবেই বলিল—ওঠ, ওঠ! ওই দেখো মূলগায়েনের গাড়ি এসে গেল।[১]

বিশ্লেষণাত্মক গদ্য

এস্থলে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থবিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরামতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্পকাল কোনো ২ দেশে তাহার প্রচারের ক্রটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরাসিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা শত ২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর

দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন পরম্পরা সিদ্ধ হয় এইরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দপ্রভুর বিগ্রহ এ কোন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্পকাল কোনো দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়।[১]

উদ্ধৃত অংশটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই লেখকের এক প্রাচীন কণ্ঠস্বর শোনা যায় (রচনাকাল ১৮১৬)। গদ্যের যে গঠনরূপের সঙ্গে আমরা অধুনা পরিচিত, তার সঙ্গে এর পার্থক্য অনেকখানি। যদৃচ্ছভাবে কিছু নমুনা তুলে দিলে এই গদ্যাংশের অপরিচিত, প্রাচীন রূপটি সহজেই চোখে পড়বে।

'আইসে', 'কহিয়া থাকেন' প্রভৃতি ক্রিয়ার রূপ বাংলা গদ্যে অনেক দিন আগেই বর্জিত হয়েছে। 'অতি মূল্য হয়', 'কেহ ২'(= কেহ কেহ), 'পরম্পরা সিদ্ধ হয়' প্রভৃতি বাক্যাংশের বাচনভঙ্গি আমাদের অপরিচিত। প্রায়ই শব্দের বানান, যেমন, 'উপকারি' 'শাস্ত্রসংমত', 'সংপ্রতি', 'নামো' (=নামও), 'ইঙ্গরেজ' আমাদের কাছে রীতিসিদ্ধ বলে মনে হয় না, কারণ লিখিত গদ্য কেবল শ্রাব্য নয়, দর্শনসিদ্ধও।

লিখিত বাংলা গদ্য তখন সবে গড়ে উঠছে। সুতরাং অর্থ-বিভাগ বোঝাতে আমরা যে সব ছেদ-চিহ্ন আজকাল ব্যবহার করি এখানে তা নেই। লেখক কেবল দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া আর

কোনো ছেদ-চিহ্ন প্রয়োগ করেন নি। লক্ষণীয় যে এই দীর্ঘ অনুচ্ছেদটিতে লেখক কেবল আটটি পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন। স্পষ্টতই বর্ত্তমান রীতি অনুযায়ী বাক্য-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ পড়ছে না। পড়তে আরম্ভ করেই দেখা যাচ্ছে, লেখক পঁচাত্তরটি শব্দের পর প্রথম পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করছেন—নিশ্চিতই সেটি একটি বাক্যের সূচক নয়। আমরা যদি লেখকের কোনো শব্দ বা শব্দ-বিন্যাস আদৌ পরিবর্তন না করি, তাহলে অংশটিকে আমরা চারটি পূর্ণ বাক্যে বিভক্ত করব এবং চারটি পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন দেব, তাছাড়া কমা ইত্যাদি চিহ্ন তো আসবেই। কিন্তু আমাদের মতো না হোক, লেখক যেভাবে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন, তাও যদৃচ্ছ বা খেয়ালমাফিক (arbitrary) নয়, তার পিছনেও তিনি একটা নিয়ম অনুসরণ করেছেন। একটু সতর্ক হয়ে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, লেখক তাঁর অভিপ্রেত অর্থবিস্তারের এক একটি ভাব-গ্রন্থি (sense-group) বোঝাতে এইরূপ পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন। অন্তত এদিক থেকে লেখকের শিল্প-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গদ্য-রচনার সেই প্রথম যুগে বাংলা গদ্যের অন্বয় কিংবা বাক্য-গঠন এক রকম বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। আলোচ্য রচনাতেও তার কিছু নিদর্শন মিলবে। '··যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন'—এই বাক্যের আধুনিকীকরণ না করেও এর কর্ত্তা 'সকলে' পদটিকে উঠিয়ে নিয়ে যদি 'সময়' ও 'যথেষ্ট' এই শব্দ দুটির মাঝখানে বসানো যেত, তাহলে বাক্যের অন্বয় তথা সুশ্রাব্যতার যে অনেকখানি উন্নতি হত তাতে সন্দেহ নেই। 'আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল'—এই জটিল বাক্যের আদিতে স্থিত উপবাক্যটির কর্ত্তা অনুপস্থিত; 'যাহাকে' এই পদের পর 'তাঁহারা' বা এই রকম কোনো বিশেষ্য-কর্ত্তা থাকা

উচিত ছিল। '···প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব'—এই বাক্যটির মধ্যে প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তির সীমারেখা মুছে গিয়েছে।

রচনাটির সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে কথাগুলি বলা হল, মনে রাখতে হবে, তা বলা হয়েছে এখনকার প্রচলিত গদ্য-রীতির সঙ্গে তুলনা করে। সুতরাং আজকের দৃষ্টিতে সেগুলিকে 'ত্রুটি' না বলাই একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেননা কোনো রচনার বিচার করা উচিত যেমন লেখকের ভাবকল্পনা ও রচনাশক্তি, তেমনি সমকালীন রচনার সাধারণ স্তরের পটভূমিতে স্থাপন করে। একথা মনে রেখে এখন রচনাটির সেই সব উপাদানের প্রতি দৃষ্টিপাত করব, যার দায়িত্ব একান্তভাবে লেখকেরই।

ছেদ-চিহ্নের অভাবের কথা আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু তা কেবল লিখিত গদ্যের চাক্ষুষ দিক থেকে। কোনো রচনায় লেখক যখন শব্দের পর শব্দ গেঁথে তাঁর অভিপ্রেত অর্থের বিস্তার করেন, তখন সেই অর্থবিস্তার-ক্রমের প্রয়োজনেই শব্দগুলি গুচ্ছবদ্ধ হয়ে এক একটি অর্থবিভাগ ও গদ্য-রচনায় তন্নির্ভর ছন্দবিভাগ গড়ে তোলে। এই বিভাগগুলি বোঝাতেই ছেদের প্রয়োজন হয়। ছেদের প্রয়োজন তাহলে রচনার অন্তর্নিহিত এবং ছেদ-চিহ্ন তার বাহ্য, চাক্ষুষ প্রতীক। সুতরাং লেখকের চিন্তাধারা যদি স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়, এবং রচনার অর্থবিস্তারক্রম যদি তদনুসারী হয়, তাহলে সে রচনায় ছেদ থাকবেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সে কালের রীতি অনুযায়ী রামমোহন ছেদ-চিহ্ন চাক্ষুষ প্রতীকরূপে ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তাঁর রচনায় ছেদসূচক অর্থবিভাগ ও তন্নির্ভর ছন্দবিভাগও রয়েছে। 'এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে/অতি অল্প দিনের নিমিত্ত/আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে/তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময়/যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন···' সমনস্ক পাঠক রচনাটি পাঠ করার সময় স্বতই

মনে মনে এইরূপ বিভাগগুলি গড়ে তোলেন। আমার মনে হয় না যে, পাঠক ইচ্ছে করলেই ভিন্নতর বিভাগ করতে পারেন। ফলত লেখকের রচনার অন্তর্নিহিত ধর্মই এই বিভাগগুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে আরো একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এগুলি প্রায় সম-দৈর্ঘ্যের, অর্থাৎ লেখকের চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা, সুষম ভাবচ্ছন্দ ও ধ্বনিচ্ছন্দ এর মধ্যে স্পষ্টত সূচিত হচ্ছে।

রচনার শব্দ-প্রকরণের দিকে লক্ষ করলে সেই একই পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সঠিক অর্থে সঠিক শব্দ প্রয়োগ করা গদ্য-রচনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। রামমোহনের এই রচনায় অর্থানুসারে শব্দ-চয়নের যে পারিপাট্য দেখা যায়, এমন কি এ যুগের রচনাতেও তা (দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে) এক রকম বিরল হয়ে এসেছে। সম্ভবত এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-রচনা তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। লক্ষ করার বিষয় যে, অকারণে তিনি কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করেন নি এবং কেবল অলংকরণের দিক থেকে কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করেন নি। ভালো গদ্য-লেখকের একটা গুণ এই যে, অভিপ্রেত অর্থের যথার্থ রূপ দেবার জন্য তিনি নতুন শব্দ গঠন করেন, কিংবা প্রচলিত শব্দকে অভিপ্রেত নতুন অর্থ দান করেন। এ রকম অন্তত দুটি শব্দ বর্তমান রচনায় আমার চোখে পড়ছে, 'পরম্পরা' এবং 'প্রাশস্ত্য'—আমার মনে হচ্ছে, যথাক্রমে tradition এবং exhuberance অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রসাদগুণ এবং সৃষ্টিধর্মিতা ছাড়া এই রচনার আর একটি বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে এর বিশুদ্ধ, তীক্ষ্ণ মননশীলতা। প্রথমত, লেখক এখানে তাঁর প্রস্তাবিত বিষয়কে অন্যূন বা অনতিরিক্তভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কোনোরূপ কবিত্ব বা অলংকরণের জন্য সঙ্গীতময় শব্দ ব্যবহার করেন নি। দ্বিতীয়ত, আবেগময়তা তিনি সর্বথা বর্জন করেছেন, এমন কি 'আত্মোপাসনা'-র মতো বিষয়ে বলতে গিয়েও

তিনি একটিও অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধ শব্দ ব্যবহার করছেন না, যা সহজেই আবেগ জাগিয়ে তোলে। আরও, 'পরমার্থবিষয়' বা 'অনাদি' শব্দ দুটিও বিশুদ্ধ আভিধানিক অর্থেই তিনি ব্যবহার করেছেন। তৃতীয়ত, তিনি তাঁর বক্তব্যকে অকাট্য যুক্তির (লজিক্যালিটি) দ্বারা গ্রথিত করেছেন, যার ক্রমগুলি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত এবং তথ্য-নির্ভর বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'তথ্য-নির্ভর' কথাটা আমি আর এক দিক থেকে লক্ষ করতে চাই। প্রতিপক্ষের বক্তব্য, মূঢ় বিশ্বাস এবং যুক্তিহীনতাকে খণ্ডিত করবার জন্য তিনি কতকগুলি উদাহরণ গ্রহণ করেছেন ; সেগুলি তিনি নির্বাচন করেছেন প্রতিপক্ষেরই সমকালীন জীবনচর্যা থেকে, যা তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় বহন করে। আর আমি পূর্বে যে ভাব-গ্রন্থি (sense-group)-এর কথা উল্লেখ করেছি, তার প্রত্যেকটিতে উক্ত তথ্যগুলি তিনি সাজিয়েছেন প্রতিবিন্যাস অলংকারের ভঙ্গিতে, যা, সেগুলির নিজের গুণেই মননশীলতাকে পুষ্ট করে। পাঠক আরো লক্ষ করবেন, এই বিশুদ্ধ (অথবা, বলুন, নীরস) মননশীলতা রচনা হিসেবে কতখানি রমণীয় হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, লেখকের বিশিষ্ট বাচনভঙ্গিই (এর পিছনে তাঁর ব্যক্তিত্বই লক্ষণীয়) এর জন্য দায়ী। স্তরে স্তরে তাঁর কণ্ঠস্বরের টোন বা কাকু মৃদু অথচ নিশ্চিতভাবে বদ্‌লে গিয়েছে। আবার বিস্ময়, কৌতুক, গাম্ভীর্য—তাঁর কণ্ঠস্বরে যে টোনই আসুক না কেন, তা কখনোই সোচ্চার হয় নি। উদাহরণ উদ্ধৃত করে এগুলো ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু পাঠককে অনুরোধ করব, 'প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব', 'বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে,' 'কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না', 'আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন' প্রভৃতি বাক্য বা বাক্যাংশগুলি লক্ষ করে নিজেই তা অনুভব করে নিতে। তাছাড়া, কোনো অভিপ্রেত অর্থকে পরিস্ফুট করার জন্য পেরেকের মাথায় হাতুড়ির ঘা দেবার মতো শব্দের বা

শব্দগুচ্ছের ওপর তিনি জোর দিতে পারেন। 'যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি' ('অত্যন্ত'-এর ওপর ঝোঁক পড়েছে), কিংবা 'কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না' –এই রকম উদাহরণ যদৃচ্ছ তুলে দেওয়া যায়।

পাঠক কি এটিকে উইট্ বা ব্যঙ্গরচনা বলবেন ? হাস্যের মাধ্যমে জড়ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ যদি উইট্ সৃষ্টির লক্ষণ হয়, তাহলে একেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী উইট্ সৃষ্টির জন্য পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন (একটি উদাহরণ আমরা পরে বিশ্লেষণ করেছি), কিন্তু যেখানে তিনি পাঠককে হাসাবার সময় নিজেই সেই হুল্লোড়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কথার সংযম রক্ষা করতে পারেন নি, সেখানে রামমোহন শান্ত, সহজ, সৌজন্যপূর্ণ ও আপাত-নিস্পৃহ। অথচ, 'কিন্তু একজনের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে', কিংবা, 'আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন শাস্ত্র বিহিত' প্রভৃতি বাক্য কীরূপ হাস্যতীক্ষ্ণ, মর্মচ্ছেদী ও অভ্রান্ত লক্ষভেদী, তা সহজেই অনুধাবন-যোগ্য॥

৬

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

এখানকার এই নির্বোধ গ্রাম্য লোকেরা যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক

হইয়া মিশিয়া গেছে। যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই, তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা না-রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা কিছু জানে, যাহা কিছু বিশ্বাস করে, নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেইজন্য তাহাদের জ্ঞানের সহিত, বিশ্বাসের সহিত, কাজের সহিত, মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণ মনে তাহার সেবা করে। সেজন্য কোনো ক্ষতিকে ক্ষতি, কোনো ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম বলিয়া জানি, কিন্তু তাহাও জ্ঞানে জানি, বিশ্বাসে জানি না। অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত এক হইয়া যায় নাই।

কিন্তু স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য। নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে দুই-চারি অংশে বিভক্ত করিলেও, কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

মানবস্বভাবের মধ্যেও জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্যের বিচ্ছিন্নতা উন্নতির নিম্নপর্যায়গত। তিনের মধ্যে অভেদ সংযোগই চরম উন্নতি।[১]

'পল্লিগ্রামে' প্রবন্ধ থেকে যে পাঁচটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলি একত্রে এখানে একটি আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত স্বতন্ত্র রচনার উদাহরণও হতে পারে। একটি তত্ত্বের সূচনা, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা অংশটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। পাঁচটি অনুচ্ছেদ অর্থবিস্তার-

ক্রমের যেন পাঁচটি ঢেউ ; এক একটি অনুচ্ছেদে এক একটি ভাবগ্রন্থি নিটোল মূর্তি পরিগ্রহ করে শেষ সিদ্ধান্তটিকে আসন্ন করে তুলেছে। প্রথম অনুচ্ছেদে মনের ঐকমুখীন সরলতা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সামান্য সত্যের উপস্থাপনা আছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পল্লীবাসীদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের সঙ্গে স্বভাবের ঐক্য সম্বন্ধে কথা রয়েছে, তা নিয়েও আছে বিশেষ সত্যের বিবৃতি। 'যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই, তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা না-রাখা তাহাদের হাতে নাই।'—এই অংশে একটি সুন্দর এ্যানালজি বা সাদৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'একটা উদাহরণ দিই'। এই অংশের প্রথমে একটি প্রতিতুলনা আছে এবং তারপর সেই সূত্রে পূর্ববর্তী বক্তব্যটিকেই বিশদ করার চেষ্টা হয়েছে যে, পল্লীবাসীদের আতিথ্যের কর্মটি কীভাবে তাদের জ্ঞান-বিশ্বাস-কর্মকে স্বভাবের সঙ্গে এক করে দিয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথমে আবার একটি সামান্য সত্যের বিবৃতি এবং তারপর একটি বিশেষ উদাহরণ নেওয়া হয়েছে (এটিকে এ্যানালজি বা সাদৃশ্য-কথনও বলা যায়)। শেষে, পঞ্চম অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের সারমর্ম দেওয়া ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং ঐকমুখীন ক্রম-পরিণত রচনার এটি একটি সুন্দর উদাহরণ, তাতে সন্দেহ নেই।

অংশটির শব্দ-সংগ্রহ তৎসমবহুল, কিন্তু ঠিক গাম্ভীর্য সৃষ্টি করা লেখকের অভিপ্রেত নয়। এর ভঙ্গিটি সহজ ও সাবহিত—যে সরলতার কথা তিনি বলেছেন, তারই অনুরূপ। যুক্তবর্ণ বেশ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ব্যঞ্জনসংঘাত নেই, অর্থাৎ ধ্বনিগত বা অর্থগত প্রয়োজনে কোনো শব্দের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ছন্দগত ধ্বনি-প্রবাহ স্পন্দিত এবং অর্থ-বিস্তার প্রগতিধর্মী কিন্তু উচ্চাবচ সংস্থানে সঘোষ নয়।

বাক্যের দৈর্ঘ্যও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। বাক্যগুলি নাতিদীর্ঘ বা নাতিহ্রস্ব নয়, তার ফলে অর্থগত ধ্বনিবিভাগের মধ্যেও বেশ

সাবহিত ভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে। ক্রিয়াপদের রূপ সাধু ভাষার, কিন্তু সেগুলির গঠন ও বিন্যাস এমন, যাতে তাকে পোশাকী করে তোলে নি, আর কথ্য ভাষাভঙ্গির কাছাকাছি এনে চটুল করেও দেয় নি। পূর্বেই আমরা যে ভাবগ্রন্থির কথা বলেছি, ভাষাগত এই লক্ষণ-গুলিও সেই গ্রন্থি তথা অনুচ্ছেদ গঠনে পোষকতা করেছে। বস্তুত, এমন সরল অথচ সুমিত অনুচ্ছেদ-গঠন অল্পই দেখা যায়।

ব্যবহৃত শব্দগুলি পুনরায় লক্ষণীয়। গদ্যের যেটা সর্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম, অর্থচিত্রগুলিকে কাল্পনিকতার আস্তরণমুক্ত বস্তুগতভাবে দেখা, এখানে সেই দুরূহ কৃত্যটি সহজভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এখানে লেখক বক্তব্যের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পেরেছেন এবং সোজাসুজি উপস্থিত করতেও পেরেছেন। এতে একঘেয়েমির একটা আশঙ্কা থাকে, কিন্তু রচনাগুণে তা হয় নি। কোনো কোনো শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্য বা বাক্যসমষ্টিকে অবলম্বন করে লেখকের কণ্ঠস্বরের টোন বা রঙ বদ্‌লেছে (পূর্বেই আলোচিত রামমোহনের রচনাভঙ্গির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে), যেগুলি অনতিলক্ষ এবং মৃদু হয়েও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বিভিন্ন উপায়ে তা নিষ্পন্ন হয়েছে: 'সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া'-র মৃদু রূপকস্পর্শে কণ্ঠস্বরের ঝোঁক অনুভূত হয়; 'নির্বোধ'-এর আভিধানিক অর্থ এক রকম কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি স্নেহের, অর্থভঙ্গি শ্লিষ্ট; 'অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না'—এখানে লেখকের কণ্ঠস্বর কিছুটা কৌতুকোদ্ভাসিত। এই সব সূক্ষ্ম রঙের পরিবর্তন রচনাটিকে রমণীয়তা দান করেছে।

শেষত, একটি কথা এখানে উল্লেখ্য। লেখকের এ্যাটিচ্যুড্ বা মনোভঙ্গি কতকটা স্বগত বা বড় জোর বিশ্রম্ভালাপের। [এর পরবর্তী উদাহরণটিতে লেখকের মনোভঙ্গির তীব্র পার্থক্য চোখে পড়বে] বর্তমান রচনাটি তথ্যভারহীন, এবং যে তত্ত্বের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্বের মতো অতিপ্রখর

নয়, এমন কি কবি-লেখকের স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যাশিত কবিত্বও এখানে অনুপস্থিত। ফলত, লেখক রচনাটিকে যে সহজ, সুন্দর ও সুষম রাখতে পেরেছেন, তা বিরল সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নেই॥

৭

এইজন্য দেখিতে পাই, য়ুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে, সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিম্বা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক, বিলম্বেই হোক, তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কী পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে—নহিলে, তার আমদানি-রফতানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসংকোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশ বিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজ-সভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধুলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি, যে পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে—যে পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা

উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধুলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল—কত সাম্রাজ্যের অহংকার ঐ পথের ধুলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন-তারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টা-পাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী—সত্যের বলে যার বল, এক দিন যাহা অন্য-সকল কলগর্জনের ঊর্ধ্বে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসন-তলে আসিয়া পৌঁছিবে।[১]

প্রথম দৃষ্টিপাতেই রচনাটিকে আবেগ-জাগানো গদ্যের (emotive prose) নিদর্শন বলে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু রচনাটিকে একটা বিশেষ মিশ্র-শ্রেণীর অন্তর্ভূত করে বিচার করা যায়, কারণ, এর মধ্যে বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতির নিপুণ অথচ প্রজ্ঞা-সমুজ্জ্বল বিশ্লেষণও আছে।

বিশ্লেষণাত্মক গদ্যের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় তথ্যের উপস্থাপনা অংশটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে—য়ুরোপের কঠিন সংকট, প্রাচ্যের দুঃখ এবং অপমান, য়ুরোপবাসীর স্বঘোষিত রীতির ব্যভিচার, আমদানি-রফ্‌তানির প্রাচুর্য, রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, প্রভুত্ব ও শস্ত্রবল, সাম্রাজ্যের অহংকার ও বিনষ্টি প্রভৃতি তার উদাহরণ। য়ুরোপীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাচ্য উপনিবেশগুলির সংগ্রামও এই সব তথ্যের অন্তর্ভূত।

রচনাটির মধ্যে উৎসাহ-প্রদীপ্ত আবেগের অনুভূতি যতটাই থাক না কেন, প্রতিটি বাক্য বা বাক্যগুচ্ছের মধ্যে পাঠকের মননের নিকট নিঃসংশয় আবেদন আছে—বিশুদ্ধ আবেগাত্মক গদ্যে কিন্তু মনন-

শীলতাকে স্থগিত বা স্তব্ধ করে রাখা হয় (পরবর্তী আবেগাত্মক গদ্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। লেখক যে আগাগোড়া প্রতিবিন্যাস অলংকার বা প্রতিবিন্যাসসমর্মী বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, অন্যান্য আঙ্গিকগত উপাদানের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেগুলি পাঠকের বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় না। এ ব্যাপারে প্রথম দুটি বাক্য লক্ষ করলেই লেখকের ভঙ্গি ও উদ্দেশ্য বোঝা যায়, তারপর শেষ পর্যন্ত পাঠকেব চিত্ত সমান সজাগ থাকে।

কিন্তু এ ব্যাপারে রূপকের ভূমিকা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। লেখক প্রায় আগাগোড়া সবটাই রূপকের মধ্যে কথা বলেছেন। প্রথম কিছুটা বাদ দিলে বাকি অংশে রূপকের আধিকারিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়—সেটি হচ্ছে এক বিচার-সভার : বিচারক হচ্ছেন 'ইতিহাস-বিধাতা', অভিযুক্ত 'য়ুরোপ'-বাসী, অভিযোক্তা 'প্রাচ্যদেশবাসী'—বিচার হচ্ছে মানবিক নীতি ও মূল্যবোধ নিয়ে। তাছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে রূপকের ছড়াছড়ি—য়ুরোপের 'কঠিন সংকট', 'বিধাতার রাজ্য', 'প্রভুত্বের বাণী', 'উচ্চ রাজতক্ত', 'পথের ধারের ধুলা', 'ভগ্ন দণ্ড' এবং 'জীর্ণ কন্থা' ইত্যাদি।

গদ্যে রূপক সাধারণত স্বাগত অতিথি নয়, কেননা অর্থবোধকে তা আচ্ছন্ন করে কাল্পনিকতা বা অলংকরণকেই মুখ্য করে তোলে। কিন্তু আলোচ্য অংশের প্রতিটি রূপকের পিছনে দৃঢ়, সুস্পষ্ট অর্থ-বোধের সমর্থন রয়েছে। সমকালীন সভ্যতার সংকটের বিভিন্ন দিক রূপকগুলির মাধ্যমে জ্বলন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এদিক থেকেও রচনাটির মিশ্র রূপ লক্ষ করা যায়—মূলত এটি বিশ্লেষণমূলক হলেও রীতিটি কাব্যিক। অধিকন্তু, লেখক মনোভঙ্গির (attitude) দিক থেকে যেহেতু নিরপেক্ষ নন, পার্টিজান, রচনার আবেদন সেজন্যে একটা উচ্চপর্যায়ে এসে পৌঁছোতে পেরেছে। ধ্বনিগত (একটু পরেই সে প্রসঙ্গে আসছি) এবং অর্থগত দুদিক থেকেই রচনাটি একটা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা পেয়েছে, লেখকের উদ্দেশ্যের পক্ষে যা সহায়ক।

এইখানে আবার সেই প্রথম কথাটা এসে পড়ে, রচনাটি আবেগাত্মকও। দীর্ঘ বাক্য এবং তন্নির্ভর উন্নত, গম্ভীর ছন্দস্পন্দ সেই আবেগকেই পরিস্ফুট করে। বাক্যগুলি দীর্ঘ বলে পড়তে হয় খানিকটা দম নিয়ে, যা আবেগোত্থ ভাবকে স্বতই সৃষ্টি করে। তাছাড়া, এখানে বিশেষ ধরনের শব্দ-সমাবেশ ও তার ফলে ছন্দের যে দোলা (আবেগের দোলার সমর্থক) ফুটে উঠেছে তাও লক্ষণীয়। ঠিক বড় বড় ঢেউএর ওঠা-পড়ার মতো। লেখক সহজ, নিরপেক্ষ ধ্বনির শব্দগুচ্ছ 'এই জন্য দেখিতে পাই', 'ভাবিয়া কূল পায় না', 'এ লইয়া বিচার নয়' প্রভৃতি যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি 'কঠিন সংকট', 'বিধাতার রাজ্য', 'রণতরীর দৈর্ঘ্য', 'রাষ্ট্রনীতির চাতুরী', 'ভগ্ন দণ্ড' এবং 'জীর্ণ কন্থা'-র মতো ধ্বনিমান ব্যঞ্জনসংঘাতযুক্ত (এগুলো সংস্কৃত রীতিতেও পড়া যায়) শব্দগুচ্ছও পাশাপাশি রেখেছেন। পাঠক লক্ষ করুন, এই দুই রকম ধ্বনিপ্রকৃতিযুক্ত শব্দগুচ্ছের সমাবেশ যদৃচ্ছভাবে হয়নি—একটা উচ্চাবচ অবস্থান-পারম্পর্য আছে। ধ্বনিস্পন্দ তথা অনুভূতির দোলা সৃষ্টির পক্ষে এটা খুবই উপযোগী।

একটু আগেই বাক্যগুলির দৈর্ঘ্যের কথা বলেছি। এই দৃশ্যটির সঙ্গে যুক্ত লেখকের প্রযুক্ত সুপ্রচুর বিশেষণ, বিশেষণগুচ্ছ বা ক্রিয়া-বিশেষণগুচ্ছ—এগুলি বর্ণনার যেমন যাথার্থ্য এনে দেয়, তেমনি তার দ্বারা লেখকের প্রসরণশীল মনোভাবেরও দ্যোতনা করে; সেটি আবেগাত্মক গদ্যেরও একটা লক্ষণ। তাছাড়া, একটু আগে যে বেশ দম নিয়ে বাক্যগুলি পড়ার কথা বলেছি—সমগ্র অনুচ্ছেদের মধ্যেও (সনেটের ক্ষেত্রে যেমন ঝটিকার একটি ঢেউয়ের আগমন-নির্গমনের কথা বলা হয়) ঠিক সেই ভাবটি লক্ষ করা যায় : লেখকের কণ্ঠস্বর ক্রমারোহের পর গানের শমে ফিরে আসার মতো শেষ বাক্যটিতে বিশ্রাম পেয়েছে। সেদিক থেকে পেশল (ভাবগত ও ধ্বনিগত দুদিক থেকেই), সুগঠিত অনুচ্ছেদেরও এটি একটি সুন্দর নিদর্শন, সন্দেহ নেই।

এখানে ক্রিয়াপদগুলির প্রকৃতি ও গঠনও লক্ষ করার মতো। ক্রিয়াপদগুলির আপাতরূপ সাধু, কিন্তু উচ্চারণভঙ্গিতে তা চল্‌তি ভাষার ধার ঘেঁষে গেছে—'ভাবিয়া কূল পায় না', 'জিজ্ঞাসা করে না', 'আসিয়া পৌঁছে' ইত্যাদি। এইরূপ ক্রিয়াপদ সংখ্যায়ও প্রচুর। এতে একটা প্যাটার্ন্ পাওয়া যায় বলে মনে করি : গম্ভীর, ধ্বনিমান তৎসম শব্দের মধ্য দিয়ে যে আবেগোত্থ উচ্চাবস্থভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি তার সঙ্গে চল্‌তি-ঘেঁষা বহুল ক্রিয়াপদের দ্বারা গতি ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতাও সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক রচনাংশে যে উৎসাহ-প্রদীপ্ত আহ্বান জানাচ্ছেন, তার পক্ষে এটা সংশয়াতীত রূপে সহায়ক হয়েছে॥

৮

অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই এ দেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে। এখন ঘোর কলি, কেননা এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে সে হচ্ছে সমালোচনা এবং আমাদের যত কিছু লাফাঝাঁপি সেসব ঐ এক পায়ের উপর, তার পর ভবিষ্যতে যখন উক্ত পদের আস্ফালন বন্ধ হবে, তখন মন্বন্তর। এসব কথা শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়ি নে, কেননা অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা ইভলিউশনপন্থী ; সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সমুখে গড়ে উঠছে। আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান। অতীতের সাহায্যে

আমরা বড়জোর বর্তমানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার আংশিক ভাবে, কিন্তু বর্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার চাইতে নির্মাণ করা যে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্তমানের জ্ঞান লাভ করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ বর্তমানকেই সবচাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সবচেয়ে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড় একটা দৃষ্টিপাত করি নে। ঐ কারণেই বর্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না এবং তার রূপ আমাদের মনে ধরে না। তাছাড়া বর্তমান একটি প্রবাহ, দিনের পর দিন হচ্ছে কালের ঢেউএর পরে ঢেউ, সুতরাং এ বর্তমানের ইয়ত্তা করতে হলে কালের ঢেউ গুনতে হয়। অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারিদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়। সুতরাং অতীতের গুণকীর্তন করা নেহাত সহজ, বিশেষতঃ চোখ বুজে। আর-এক কথা, স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি এবং তা সমাজের ভোগ-দখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশি মানও বেশি। বর্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর। এবং তার যা ভোগ সে শুধু কর্মভোগ। এই কারণে বর্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বর্তমান সাহিত্য হচ্ছে বর্তমানেরই একটি অঙ্গ, কাজেই বর্তমান সাহিত্যিকরা গেঁয়ো যোগীর ন্যায় সমাজের কাছে ভক্তি পাওয়া দূরে থাক্, ভিখও পান না। অথচ এই উপেক্ষিত বর্তমানই যখন আমাদের অদূর-ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয় তো এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।[১]

উদ্ধৃতাংশটি, এক লহমার দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায়, সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ে উইট্ বা ব্যঙ্গ-রচনার উদাহরণ, যাতে প্রচলিত কোনো ধারণার অনড় বা অবাঞ্ছিত দিককে লেখক হাসির বাণে বিদ্ধ করেন। এই ধরনের রচনার যেমন সহজ আকর্ষণ-যোগ্যতা আছে, তেমনি তাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্বও বেশ কঠিন। এতে লেখকের হাতে থাকে অজস্র উপকরণ—অনুপ্রাস, শ্লেষ, বক্রোক্তি, রূপক, ঈষৎ তির্যক অর্থে একই কথার পুনরুক্তি, এমন কি কথা নিয়ে কিছুটা খেলা করাও। কিন্তু এ জাতীয় রচনা ব্যালান্সের খেলার মতো, আপাত রমণীয়তার অন্তরালে অনেকখানি দক্ষ সতর্কতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। কথা নিয়ে খেলা (কিংবা, বাড়াবাড়ি) করার অবকাশ আছে বলেই কথার সংযম এখানে খুব বেশি দরকার।

গদ্যের বাঞ্ছিততম গুণ হচ্ছে অর্থস্ফুটতা। সে ক্ষেত্রে গদ্যে রূপক-ব্যবহার যদি অর্থচিত্রকে সজীবতা, সুস্পষ্টতা বা অভিপ্রেত ব্যাপ্তি দান করে, তাহলে তাকে স্বীকার করে নিতে অসুবিধে নেই। উদ্ধৃত অংশের প্রথম বাক্যে 'সাহিত্যের সত্যযুগ' রূপকটি সেদিক থেকে রম্য, বিশেষ করে সত্যযুগ কথাটার মধ্যে যে অনুষঙ্গ জড়িত তাকে লেখক যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ হিসেবে ছুঁড়ে মেরেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে লেখক যখন পরম্পরিত রূপকের উপমানগুলোকে পরপর আলোকিত করতে চাইলেন, আতসবাজিতে যেমন আগুনের রঙ আর আকৃতি বদলাতেই থাকে, তেমনি করে তখন তাঁকে বলে যেতে হল, 'ঘোর কলি', 'এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে', এবং তারও পরে পরে, 'আমাদের যত কিছু লাফাঝাঁপি', 'পদের আস্ফালন' ও 'মন্বন্তর'।

এখন, গদ্যে সার্থক রূপকের উপমানের পিছনে উপমেয়ের দৃঢ় সমর্থন থাকে, এখানে প্রথম রূপক 'সাহিত্যের সত্যযুগ' সম্বন্ধে যা বলা যায়। কিন্তু 'সত্যযুগ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বাকি যে সব উপমান

লেখক ঝোঁকের বশে আহরণ করে চলেছেন, চমক লাগালেও সে সবের পিছনে বিষয়ের সেরূপ সংগতি আছে কি ? বিষয়ার্থ একেবারেই পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু কতকটা জোর করে টেনে আনতে হয়। 'ঘোর কলি'-র অর্থ যদিও বা পাওয়া যায়, সে অর্থ ক্ষীয়মাণ হতে হতে 'মন্বন্তর'-এ এসে এক রকম শূন্যের কোঠায় পৌছে। মানে, 'মন্বন্তর'-এর অর্থ কী দাঁড়ায় ? এর ফলে, অর্থের অগ্রগতি কিছু হয় না, কথার সম্প্রসারণ হয় এবং রচনা ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে পড়ে। পরবর্তী অংশে লেখক বলছেন, '···অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা ইভলিউশন-পন্থী ; সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠছে।' এ অংশেও 'সত্যযুগ' কথাটা এসেছে আসুক, আমাদের হোঁচট খেতে হয় 'ইভলিউশন-পন্থী' কথাটায়। এ পর্যন্ত আহৃত তৎসম, পুরাণ-ঘেঁষা শব্দ-সংহতিতে শব্দটি পরদেশী সে জন্যে নয়, ইভলিউশনের ধারণাটিকে লেখক যদৃচ্ছ দুমড়ে-মুচড়ে ফেলেছেন বলে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইভলিউশন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী, কিন্তু লেখক প্রথমেই অতীতকে ছাঁটাই করেছেন। সুতরাং এখানে বিজ্ঞানের স্টান্ট দেওয়া হল এবং ভাষাকে আবার ভঙ্গিসর্বস্ব করা হল।

এরপর, একটি দীর্ঘ অংশ, 'সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান····· এই কারণে বর্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না।'—এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। এর মধ্যে চৌদ্দটি বাক্য আছে এবং লেখকের মূল বক্তব্য প্রথম বাক্যটির মধ্যেই উপস্থাপিত হয়ে গেছে ; সেটি হচ্ছে এই : 'অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান'। একথা ঠিক যে, কোনো একটি বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রচনার গতি থামিয়ে হলেও আরও একটি বা দুটি বাক্য তার সমর্থনে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেদিক থেকে এই অংশের দ্বিতীয় বাক্যটিকে অর্থবহ মনে করা যায়। কিন্তু তার পরের বারোটি বাক্যে বিভিন্ন বিষয় থেকে

উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটিকে সমর্থন করা হয়েছে, যাতে লেখকের বক্তব্য তার পরের ধাপটিতে আর যেতে পারছে না, পাঠককে তিনি একই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। কবিতায় অবশ্য একই ভাববস্তুকে কখনো কখনো নতুন নতুন চিত্রকল্প দিয়ে সমর্থন ও সমৃদ্ধ করা হয়। কিন্তু বর্তমান রচনাটিকে ব্যঙ্গ-প্রধান বলে যদি স্বীকার করাও যায় যে কথা নিয়ে খেলা করার অধিকার লেখকের আছে, তবু নিশ্চিতই তা বারোটি বাক্যে প্রসারিত হতে পারে না, অনেক আগেই তা সংযত করা প্রত্যাশিত ছিল। চমক-লাগানো অথচ অর্থগত রম্যতাহীন কবিওয়ালাদের রচনা কীরূপ ক্লান্তিকর তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এখন, এই যে আমরা রূপক-রচনার আংশিক অর্থশূন্যতা, কথা নিয়ে খেলায় অসংযমের লক্ষণ, পুনরাবৃত্তির ক্লান্তিকরত্ব অর্থাৎ রচনার ভঙ্গিসর্বস্বতার কথা বললাম, সেটাকেই কোনো কোনো সমালোচক স্বাগত জানিয়েছেন, 'বলার ভঙ্গি বলার বিষয়কে মনে ছাপিয়ে উঠেছিল'।[১] সেটা যদি আপাতত স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে রচনাটির অন্য কয়েকটি স্বাগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

চলতি ভাষার গদ্যের যে একটি বিশেষ ছাঁদ আছে, বর্তমান রচনাটি তার একটি সুন্দর নিদর্শন। লেখক 'বলে থাকেন', 'গড়ে উঠছে', 'করতে পারি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন বলেই নয়, কেননা এহ বাহ্য ; এমন কি 'লাফাঝাঁপি', 'পা', 'ভুঁই', 'ঢের', 'ভিখ', 'ঢেউ', 'ছোঁওয়া' প্রভৃতি চল্‌তি কথার হাল্‌কা শব্দ ব্যবহারের জন্যও নয়, কারণ, এগুলি সংখ্যায় অতি অল্প (অর্থাৎ কেবল এগুলোর দ্বারাই কোনো প্রবণতা সূচিত হচ্ছে না) এবং তার পাশে পাশে অনেক ভারী তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলোই সংখ্যায় বেশি। এই অংশের চলতি ভাষার আদল নির্ভর করছে পূর্বোক্ত দুটি লক্ষণ ছাড়াও আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের ওপর। প্রথমত, ভারীই হোক আর

হাল্‌কাই হোক, তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারিত নয়, বাংলা উচ্চারণের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায়ই লক্ষ করা যায় ; তাছাড়াও সমগ্র রচনাটি ব্যঙ্গ-কৌতুকে ভরা বলে, উচ্চারণে চটুলতা এবং ঈষৎলক্ষ বাঁকা ভাব এসে পড়ে। দ্বিতীয়ত, শব্দ-বিন্যাসের গুণে বাক্যের গঠন-রীতি একেবারে কথা বলার ধার ঘেঁষে গেছে, ঠিক এই ভাবটি চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকের লেখায় ফোটে না।

অংশটির বাক্য-গঠন, অনুচ্ছেদ-রচনা এবং ছন্দ-প্রবাহের বিষয়ও এখানে আলোচনীয়। আমরা আগেই সমগ্রভাবে গ্রহণ করে রচনাটির মধ্যে অহেতুক কথা নিয়ে খেলা করা, ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ইত্যাদির কথা বলেছি। কিন্তু এক একটি বাক্যকে যদি পৃথক ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেগুলিকে সুগঠিত বলে স্বীকার করতে হবে। 'অনেকে বলে থাকেন যে,/আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ/ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই/এ দেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে।'—এই বাক্যের অর্থবিভাগ ও ছন্দবিভাগ এইভাবে সমপাতী হয়ে বাক্যটিকে এগিয়ে দিয়েছে। মননপ্রধান রচনা বলে ছন্দস্পন্দও সোচ্চার নয়। বাক্যগুলির অধিকাংশই প্রায় একই মাপের, নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব। এতে একঘেয়েমির ঝুঁকি সত্ত্বেও, লেখকের একটা সমতারক্ষী সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অনুচ্ছেদটি মোটেই সুগঠিত নয়—অর্থবিস্তার ক্রমগতিসম্পন্ন হয়ে একটি পূর্ণ অর্থচিত্রকে সূচনা-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত অখণ্ডতা দান করবে, এই লক্ষণ অনুচ্ছেদটির মধ্যে পাওয়া যায় না। অকারণ কথায় পাঠকের মানস-অগ্রগতি মাঝে-মাঝেই ব্যাহত হয়েছে, দ্বিতীয়ত সমগ্রভাবে বাক্যগুলির ভাবানুসারী হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, এবং তার সঙ্গে তাল রেখে ছন্দস্পন্দের আরোহ-অবরোহ ক্রম লক্ষণীয় নয়। একটি আদর্শ অনুচ্ছেদ গঠনের পক্ষে এগুলোর প্রয়োজন ছিল।

উইট্‌ বা ব্যঙ্গ-প্রধান রচনার একটা গুণ মননশীলতা। এই গুণটি ফুটিয়ে তুলতে বাক্যবিন্যাসে একটা লজিক্যালিটি বা

নৈয়ায়িকতার প্রয়োজন (পূর্বেই আলোচিত রামমোহনের রচনার উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। সেটি এখানে ঠিক ফুটেছে কিনা সংশয়ের বিষয়, কিন্তু তার একটা বাহ্য ভঙ্গি অন্তত এখানে লক্ষ করা যায়: 'কেননা', 'সুতরাং', 'অতএব', 'ঐ কারণেই', 'অপরপক্ষে' কথাগুলো লেখক ব্যবহার করেছেন এবং অতিরিক্তভাবেই করেছেন। পক্ষান্তরে, 'মানুষ বর্তমানকেই সবচাইতে কম চেনে', 'এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সব চেয়ে অপরিচিত', কিংবা 'যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড়-একটা দৃষ্টিপাত করি নে' প্রভৃতি এপিগ্রাম-জাতীয় বাক্য নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিপোষক ॥

৯

এক

এই তাড়িত ও চৌম্বকশক্তি কি, এত দিন তাহা বড় ঠিক ছিল না। ম্যাক্সওয়েল তাহা স্থির করেন। ঈথর বা আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; ইস্পাতের স্প্রিং বা রবরের সূতা যেমন জিনিষ, কতকটা সেই গোছের। টানিয়া ধরিতে জোর লাগে, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বের অবস্থা পায়। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা একবারে পায় না। স্প্রিংটি টানিয়া ছাড়িলেই বার কত ঘন ঘন দুলিতে থাকে, এবং দুলিতে দুলিতে অবশেষে থামিয়া যায়। অনেক জিনিষ আছে, যাহা স্থিতিস্থাপক নহে; যেমন নরম মাটি, নরম গালা, মোম। টানিলে বাড়িয়া বা বাঁকিয়া যাইবে, ছাড়িলে দুলিবেও না, পূর্ব্বাবস্থাও পাইবে না, বাড়িয়া ও বাঁকিয়াই থাকিবে। আকাশ কতকটা স্প্রিঙের মত; উহার কোন অংশ একটু নাড়িয়া ছাড়িলে

উহা দুলিতে থাকে, এবং এইরূপ দুলিতে থাকে ও স্পন্দিত হয় বলিয়াই চারি দিকে আকাশে ঢেউ উঠে; সেই স্পন্দন ও আন্দোলন ক্রমশঃ সংক্রামিত ও সঞ্চালিত হইয়া ঢেউ উৎপাদন করে। জল ও বায়ু এক অর্থে স্থিতিস্থাপক; কাজেই তাহার এক অংশের আন্দোলনে সমস্তটা আন্দোলিত হইয়া জলে জল-তরঙ্গ ও বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে। স্থিতিস্থাপক ঈথরে যখন টান পড়ে, তখনই তাড়িতশক্তির বিকাশ হয়। রবরের সূতা দুই হাতে টানিয়া ধরিলে সেই সূতার যেমন অবস্থা হয়, কাচে রেশম ঘষিয়া কাচখানি সরাইয়া লইলে, চুলে চিরুনি ঘষিয়া চিরুনি-খানি সরাইলে, উভয় দ্রব্যের মাঝে, কাচ ও রেশমের মাঝে, চুল ও চিরুনির মাঝে যে ঈথর থাকে, তাহারও কতকটা সেইরূপ অবস্থা হয়। যে দ্রব্যে তাড়িতভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহার পাশের ও চারি দিকের আকাশে যেন টান পড়ে। রবরের সূতা টানিয়া ধরায় দুই হাতে যেমন পাল্টা টান পড়ে, এক হাত আর এক হাতের কাছে যাইতে চায়; তেমনই মাঝের ঈথরে টান পড়ায় কাগজের টুকরাগুলি চিরুনির দিকে বা কাচের দিকে যাইতে চায় ও লাফাইয়া উঠে।[১]

দুই

অন্যান্য ক্ষারকীয় পদার্থ—কাচ নির্মাণে সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের অক্সাইড ভিন্ন লেড, বেরিয়াম, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইডও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি অপ্‌টিক্যাল গ্লাসের প্রয়োজনীয় উপাদানও বটে। নীচে এগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হলো—

লেডের অক্সাইড সাধারণতঃ লিথার্জ বা রেড লেড হিসাবে যোগ করা হয়। এতে কাচের ঘনত্ব ও প্রতিসরণাঙ্ক বেড়ে যায়। বেরিয়াম অক্সাইড, এর সালফেট অথবা কার্বোনেট থেকে পাওয়া যায়। এই

অক্সাইড কাচের ঔজ্জ্বল্য, ঘাতসহনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। ক্যালসিয়ামের অক্সাইড, এর যৌগ, যেমন—কার্বোনেট, সালফেট থেকে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ক্যালসিয়াম অক্সাইড কাচ তৈরির একটি প্রধান ও আবশ্যিক উপাদান। এটা কাচের রাসায়নিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। খুব বেশী পরিমাণে এর ব্যবহার কিন্তু কাচের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ তাতে কেলাস গঠনের সম্ভাবনা থাকে। উপযুক্ত পরিমাণে দিলে কাচের তাপীয় পরিবাহিতা, কোমলায়ন উষ্ণতা, যান্ত্রিক শক্তি, তাপ-সহিষ্ণুতা, ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণাঙ্কও কমে যায়। ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট প্রভৃতি আকরিক থেকে পাওয়া যায় এবং অল্প ব্যবহারে কাচ তৈরির কাঁচামাল সহজেই গলে। ফেলস্পার ও ক্রায়োলাইটকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এটি কাচে কেলাস সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করে ও সহজে গলতে সাহায্য করে। অল্প পরিমাণে ব্যবহারের ফলে কাচের সান্দ্রতা, কাঠিন্য, স্থায়িত্ব, স্থিতি-স্থাপকতা, প্রাসর্যতা, ঔজ্জ্বল্য, অ্যাসিড-প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এটা সমসত্ত্বতার (Homogenous) উন্নতি করে, প্রসারণাঙ্ক, কোমলায়ন উষ্ণতা কমায়। জিঙ্ক হোয়াইট (ZnO) সাধারণতঃ রসায়নাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কাচ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। অধাতব অক্সাইড, আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড কাচ-প্রস্তুতিতে ব্যবহার করলে এগুলি বুদ্‌বুদ দূরীকরণে সাহায্য করে।[১]

একদিক থেকে বৈজ্ঞানিক রচনাকে সর্বাপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে করা হয়। তার কারণ বৈজ্ঞানিক কেবল তথ্যসমূহ এবং সেই সমস্ত তথ্য থেকে নৈয়ায়িক ও অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্ত স্বতই

নিষ্কাসিত হয়ে আসে তাকেই উপস্থাপিত করে থাকেন। এর থেকে আপাততঃ মনে হতে পারে, বৈজ্ঞানিক রচনা একেবারেই যান্ত্রিক, তাতে ব্যক্তিগত মানসিকতা, সাহিত্যগুণ বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। বিজ্ঞানের যে কোনা শাখার যে কোনো তথ্যই হোক না কেন, তা মানুষেরই পাওয়া। মানুষের তথ্যদৃষ্টির স্বাভাবিক ভুলত্রুটি ও তৎসঞ্জাত সম্ভাব্য অপসিদ্ধান্তের কথা ছেড়ে দিলেও, তথ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের বিশেষ মনোভঙ্গি (এ্যাটিচ্যুড্) থাকতে বাধ্য—জীবন-সম্পর্কিত মনোভঙ্গি যদি নাও থাকে। গণিতশাস্ত্রকে যদি বিশুদ্ধতম বিজ্ঞান বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনায় লেখকের আত্মগত উপাদান কম-বেশি পরিমাণে এসে পড়বেই। বৈজ্ঞানিক রচনায় প্রকল্প (হাইপথিসিস) থাকে, পাঠকের কথা এবং তাঁকে বোঝানোর কথা অল্পবিস্তর লেখকের মনে কাজ করে ('জনপ্রিয় বিজ্ঞান' কথাটা ভুলে যাবার নয়), ভাষাপ্রয়োগ রীতিও বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রকম, সর্বোপরি পদার্থ-বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার সমূহের দ্বারা দর্শন ও বিজ্ঞানের সীমারেখা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে, ইত্যাদি। এই সব কারণে বৈজ্ঞানিক রচনাতেও লেখকের মন্ময়তা এসে যায় এবং সাহিত্যধর্মের বিচিত্র স্তর লক্ষণীয় হয়ে থাকে। তাই, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে যাকে আমরা একেবারে 'নীরস' রচনা বলি তাও যেমন আছে, তেমনি এও আমাদের জানা যে, পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান আলোচনাতেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার যে দুটি উদাহরণ আমরা উদ্ধৃত করেছি, সে দুটিতে প্রচুর তথ্য-সমাবেশ থাকলেও দুই রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেকখানি। দুইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তো আছেই, বিষয়ের উপস্থাপনা সম্পর্কে দুই লেখকের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা। রামেন্দ্রসুন্দর 'তাড়িত ও চৌম্বকশক্তি কি' শুধু তার পরিচয়ই

দিচ্ছেন না, তিনি মোটেই অনাসক্ত নন, বরঞ্চ তিনি পাঠে বোঝাবার জন্য উৎসুক। দ্বিতীয় উদাহরণে চক্রবর্তী ও দাশ 'আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কাচ বা অপ্‌টিক্যাল গ্লাস' সম্বন্ধে তথ্যগুলি পরপর বিবৃত করে গেছেন, বোঝানোর প্রয়াসের ব্যাপারে তাঁরা নিরপেক্ষ।

প্রস্তাবিত বিষয়ের তথ্য সম্পর্কেও দুই লেখকের মনোভঙ্গিও আলাদা। রচনা দুটির একটু ভিতরে প্রবেশ করা যাক।

তাড়িত ও চৌম্বকশক্তি কী, রামেন্দ্রসুন্দর তারই বিবৃতি দিতে চান এবং তা করতে গিয়ে ঈথর বা আকাশের ধর্ম ও সক্রিয়তার কথা বিশদভাবে বলেছেন। সেটি আবার অপেক্ষাকৃত জ্ঞাত পদার্থ রবারের সুতো বা স্প্রিংয়ের সক্রিয়তার সাদৃশ্যে বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে, রবার স্থিতিস্থাপক, এই বোধটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লেখক বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন যে, মাটি, মোম, গালা এগুলো স্থিতিস্থাপক নয়। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের এই যে রীতি লেখক অবলম্বন করেছেন, তা ঠিক উপমা বা রূপকের মতো অলংকরণ নয়। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ হতে গিয়েও লেখক সদৃশ ও বিসদৃশ বস্তুকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, তাতেই একটা প্যাটার্ন বা রূপকল্প গড়ে উঠেছে। সুতরাং যে বস্তুকে তিনি দেখাবেন, তার বাইরেও একটা বিচিত্র বস্তুজগতের ছবি তিনি এঁকেছেন, যাতে রচনাটি সহজেই চিত্রধর্মী হয়েছে।

পক্ষান্তরে, চক্রবর্তী ও দাশ সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দর অপেক্ষাও অধিকতর তথ্য-সমাবেশ করেও টর্চের আলোক-রেখাটির মতো কেবল অপ্‌টিক্যাল গ্লাসের ওপরই তাঁদের দৃষ্টি স্থির করে রেখেছেন। কাচ নির্মাণে কোন কোন ক্ষারকীয় পদার্থ ব্যবহৃত হয় প্রথমেই লেখকদ্বয় তার উল্লেখ করলেন। তারপর দীর্ঘতর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তাদের এক একটিকে গ্রহণ করে কোন্‌টি কোথা থেকে পাওয়া যায় এবং কোন্‌টির কী গুণাগুণ তা নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করে গেলেন, যেমন,

উদাহরণত, 'বেরিয়াম অক্সাইড, এর সালফেট অথবা কার্বোনেট থেকে পাওয়া যায়। এই অক্সাইড কাচের ঔজ্জ্বল্য, ঘাতসহনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়।'

দ্বিতীয়ত, রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারে, মনে হচ্ছে, একান্তই অনিচ্ছুক। সম্ভবত, তাঁর সমকালীন পাঠকদের কথা মনে রেখেই তিনি এইরূপ করেছেন—এই জন্য তাঁর বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তাঁকে বহু-পরিচিত বস্তুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের অবতারণা করতে হয়েছে। অপর পক্ষে পরবর্তী লেখকদ্বয় নির্দ্বিধায় পারিভাষিক শব্দ ছাড়া কথা বলেন নি। সাম্প্রতিক কালের পাঠকদের বর্ধিষ্ণু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কথা হয়তো তাঁদের মনে থেকে থাকবে, নয় তো তাঁদের পরিচায়িকাকে তাঁরা সর্ববিধ সাহিত্যিক সৌগন্ধ্য থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন—যা, অবশ্যই সাহিত্যের আর এক রূপ সূচিত করে।

পাঠযোগ্য গদ্য হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা অনেক মনোরম, সহজ, ভারহীন; কিন্তু চক্রবর্তী ও দাশের রচনা আপাত-নীরস, কঠিন, ভারঋদ্ধ ও ঘনপিনদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দর বিষয়ের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে রয়েছেন; চক্রবর্তী ও দাশ বজায় রেখে চলেছেন বিষয় থেকে নিস্পৃহ দূরত্ব॥

১০

মানবশিশুর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে, বহির্জগতের সঙ্গে তার মনের কাজকারবার তখন থেকেই শুরু হয়। রবি শশী গ্রহ তারা ও বিবিধ জ্যোতিষ্কে পরিশোভিত ঊর্ধ্বে

অর্থ বোঝায় না : 'প্রত্যেকটিই হচ্ছে দু রকমের' এতে বোঝায়, প্রত্যেকটি অনুভূতি দুঃখ ও আনন্দ দুইই দেয়। তাঁর বক্তব্য : এক অনুভূতি দুঃখ দেয়, অন্য অনুভূতি আনন্দ দেয়। তাছাড়া, 'দুঃখ'-এর বিপরীত ঠিক 'আনন্দ' নয়, সুখ-দুঃখ কিংবা আনন্দ-বেদনা যে কোনো যুগ্মক ব্যবহৃত হতে পারত।

'সৃষ্টির আদিযুগের মানবজাতির অনুভূতি এবং মানসিক অবস্থাও ছিল এই মানবশিশুর অবস্থারই অনুরূপ।'—এই অংশের এ্যানালজি বা সাদৃশ্য-কথন শৈলীর দিক থেকে আপাত-সুন্দর, কিন্তু বক্তব্যে স্থূল সাধারণীকরণ দেখা দিয়েছে। 'এই মানবশিশুর অবস্থারই অনুরূপ' এই অংশের আগে 'কতকটা', 'অনেকটা' বা এই রকম কোনো বিশেষক উপযুক্ত হত ॥

১১

মায়াবাদ কী। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

এ পর্যন্ত যতপ্রকার দর্শন বা দার্শনিক মত প্রচারিত আছে তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ।

এক কথায় বলিতে গেলে, কার্যকারণতত্ত্ব, অথবা কার্যের সহিত কারণের কী সম্বন্ধ, তাহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। আমরা কার্য দেখিয়া থাকি, সেই কার্য কোথা হইতে আসিল, অর্থাৎ তাহার কারণ কী, আর সেই কারণের সহিত ঐ কার্যের সম্বন্ধ কী, তাহা প্রায়ই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তাহা জানিবার জন্য এ পর্যন্ত মানুষ যাহা কিছু ভাবিয়াছে, সেই ভাবনার সমষ্টিই তো দর্শন।

এই কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার না করিয়া মনুষ্যসমাজ উন্নতির

পথে অগ্রসর হইতে পারে না—এই কার্য ও কারণের তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে, মানুষ অতীতের অব্যক্ত গর্ভ হইতে যে কত জ্ঞাতব্য বিষয়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে। পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, খগোলতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি মানবসভ্যতার গৌরবের সামগ্রীগুলিকে মানুষ পাইল কোথা হইতে। অতীতের ভাবনাই এই সকল তত্ত্বাবিষ্কারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নহে কি। আবার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখো—এই কার্য ও কারণের ভাবনারূপ আলোকসাহায্যেই, আমরা ভবিষ্যত্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় গহ্বরে যে-সকল গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে তাহার সন্ধান পাইতেছি। ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া মনুষ্যসমাজ যে অভ্যুদয়ের পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না—ইহা কে না বুঝে। কার্য ভবিষ্যৎ—কারণ বর্তমান, আবার কার্য বর্তমান—কারণ অতীত। সুতরাং কার্য ও কারণ এই দুইটিই তো আমাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান।

তাই বলিতেছি যে, কার্য ও কারণের তত্ত্ব লইয়াই দর্শনশাস্ত্র। এই ভাবে দেখিতে গেলে ইহাও মানিতে হয় যে, দর্শনশাস্ত্রই মানবের সকল বিদ্যার মূলভিত্তি। ধর্মনীতি, রাজনীতি, গণিতবিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, বার্তাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র; বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ এবং আবেস্তা প্রভৃতি—যত কিছু মনুষ্যজাতির জ্ঞান-গৌরবের সমুজ্জ্বল নিদর্শন—সে সকলই তো, এই কার্যকারণভাবনারূপ এক অকম্প্যভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত। কার্য ও কারণের ভাবনাই তো দর্শন, সুতরাং দর্শনশাস্ত্রই যে আমাদের সকল শাস্ত্রের অপরিহার্য অবলম্বন—তাহা কে না স্বীকার করিবে।

এই কার্য ও কারণের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এ পর্যন্ত জগতের দার্শনিকগণ তিন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; সেই সিদ্ধান্ত তিনটির নাম যথাক্রমে—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। এই তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে যেটি শেষ, অর্থাৎ বিবর্তবাদ, সেই বিবর্তবাদ ও মায়াবাদ একই বস্তু। এই বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ বুঝিতে হইলে, অগ্রে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে; সেইজন্য আমি যথাক্রমে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অগ্রে দিব।[১]

নীলাকাশ, নিম্নে সসাগরা বহু জীবজন্তু-তরুলতাসমাকীর্ণ মাটির পৃথিবী, অন্তরীক্ষে মেঘ, বায়ু ও জল এবং চারিদিকে আলো-আঁধারের লীলাখেলা তার শিশুমনকে চমকিত ও বিচলিত করে তোলে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ঘটে, তাতে সে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের অনুভূতি লাভ করে। সে দেখতে পায়, এ সব অনুভূতির প্রত্যেকটিই হচ্ছে দু রকমের,—একটি তাকে দেয় আনন্দ, অন্যটিতে সে পায় দুঃখ। স্বভাবের প্রেরণায় সে চায় দুঃখের অনুভূতিগুলিকে এড়াতে ও আনন্দের অনুভূতিগুলিকে বাড়াতে। এর ফলে তার মনে জেগে ওঠে বিবিধ জিজ্ঞাসা। শিশুমুখের 'কি ও কেন' প্রশ্নের অত্যাচারে উত্যক্ত বা অপ্রতিভ হন নি, এমন বয়োবৃদ্ধের সংখ্যা বিরল। সৃষ্টির আদিযুগের মানবজাতির অনুভূতি এবং মানসিক অবস্থাও ছিল এই মানবশিশুর অবস্থারই অনুরূপ। যুগযুগান্তর ধরে মানুষের মন এই সব জিজ্ঞাসারই সমাধান খুঁজছে। তারই ফলে মানুষের ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান উঠেছে গড়ে।[১]

বিজ্ঞানের পন্থা ও লক্ষ কী তার প্রস্তাবিত আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত অংশে প্রথমেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনায় যে তথ্য-বিন্যাস ও সিদ্ধান্তের নৈয়ায়িকতা প্রত্যাশিত, এখানে তা অনুসরণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু এটিকে ঠিক সার্থক রচনা-কর্মের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করার বাধা আছে।

'মানবশিশুর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জেগে ওঠে, বহির্জগতের সঙ্গে তার মনের কাজকারবার তখন থেকেই শুরু হয়।'—এই অংশে প্রথমেই কার্য-কারণের বিপর্যয় ঘটানো হয়েছে। জ্ঞানোন্মেষ > ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জেগে ওঠা >

বহির্জগতের সঙ্গে মনের কাজকারবার চলা—এই ক্রম মোটেই তথ্যসম্মত নয়, বরঞ্চ বক্তব্য যে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের সংস্পর্শে মানুষের জ্ঞানোন্মেষ ঘটে। 'মনের কাজকারবার'-এর রূপকস্পর্শ ঠিক সুখাবহ হয়েছে কি? এর পূর্বে এবং পরে লেখক যে সব ভারী, আবেগঋদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলির সঙ্গে ধ্বনি-প্রকৃতির দিক থেকে তা বেমানান; বরঞ্চ পরবর্তী অংশে একই কথা বোঝাতে তিনি যে 'সম্পর্ক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, ধ্বনি এবং অর্থের দিক থেকে তা অনেক বেশি উপযুক্ত।

পরবর্তী দীর্ঘ দ্বিতীয় বাক্যটিতে লেখক এমন সব শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন, যা বিচিত্র ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গ-জড়িত: 'রবি শশী গ্রহ তারা', 'বিবিধ জ্যোতিষ্কে পরিশোভিত ঊর্ধ্বে নীলাকাশ', 'সসাগরা', 'জীবজন্তু-তরুলতাসমাকীর্ণ মাটির পৃথিবী', 'অন্তরীক্ষে', 'আলো আঁধারের লীলাখেলা' প্রভৃতি এবং পরের বাক্যে রয়েছে 'রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের অনুভূতি।' এগুলি আমাদের কাব্য ও দর্শন জগতের অধিবাসী, কেবল প্রয়োগের দ্বারাই তারা ভিন্নতর পরিচিত আবেগ সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক রচনাতেও কবিত্ব ও দার্শনিকতা থাকতে পারে কিন্তু দেখতে হবে তা যেন অপবিন্যস্ত না হয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের কথামুখের শব্দ সতর্ক-প্রযুক্ত ও বাক্য-গঠন ঋজু, অর্থবহ হওয়া প্রত্যাশিত, এখানে তার অভাব আছে বলেই মনে হয়। প্রচলিত, ঐতিহ্যসমৃদ্ধ উক্ত শব্দগুলিকে তিনি যদি নতুন অর্থবহ করে তুলতে পারতেন, তাহলেও তা সমর্থন-যোগ্য হত। দ্বিতীয় বাক্যের শেষাংশে 'চমকিত' ও 'বিচলিত' এই যে দুটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, বস্তুজগতের সংস্পর্শে শিশুমনের প্রতিক্রিয়া বোঝাতে তা ঠিক যথাযথ নয়, 'বিচলিত' মনে হয় অচল।

'এ সব অনুভূতির প্রত্যেকটিই হচ্ছে দু রকমের,—একটি তাকে দেয় আনন্দ, অন্যটিতে সে পায় দুঃখ।'—এই অংশের রচনা অভিপ্রেত

এক দিক থেকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গদ্য সমধর্মী, কারণ বস্তুজগৎ ও সত্য নিয়েই উভয় শাস্ত্র আলোচনা করে থাকে। তথ্যের উপস্থাপনা, সেগুলির তুলনামূলক বিচার ও নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে বিজ্ঞান ও দর্শনের গুরুতর পার্থক্য আছে : বিজ্ঞানের লক্ষ সত্যানুসন্ধান, সে সত্য যে রূপেই আসুক না কেন ; পক্ষান্তরে, দর্শনের লক্ষও সত্যানুসন্ধান, তবে তা হচ্ছে পরম সত্য, এ্যাব্‌সলিউট ট্রুথ। এই লক্ষের পার্থক্যের জন্য উভয় শাস্ত্রের রীতি প্রকরণের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও রচনা-বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এসে গেছে অনেকখানি—বর্তমান উদাহরণের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মায়াবাদ কি তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক দার্শনিক মত সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং সেই তিন ভাগের নামও উল্লেখ করেছেন। আপাতত ভঙ্গিটি বৈজ্ঞানিকের কিন্তু 'এ পর্যন্ত যত প্রকার দর্শন' প্রচলিত আছে, সেগুলির উক্ত তিনটি ভাগই করা যায়, এ কথা বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে বলা যায় কি ? প্রকৃত পক্ষে, দার্শনিকের একটা প্রবণতা হচ্ছে, তিনি যেটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সেটিকেই আপাত-তথ্যের সমর্থনে সৃষ্টি করে তোলেন। এই রচনার মধ্যেই সেই মানস-প্রবণতার উদাহরণ আছে : যেমন, 'এই কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার না করিয়া মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না', কিংবা, 'পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, খগোল-তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি মানব সভ্যতার গৌরবের সামগ্রীগুলি' সবই মানুষ পেয়েছে কার্য-কারণ তত্ত্ব থেকে—লেখকের স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্তের ওপর এই রকম অতিশয়িত জোর দেওয়া। সুতরাং তথ্য, বিচার ও বিশ্লেষণ থাকলেও দার্শনিকের রচনা সৃষ্টিধর্মী এবং তাতে তাঁর মানসিক আরোপও অনেকখানি, তা অনস্বীকার্য। বর্তমান লেখকের ইতস্তত ভাষা-প্রয়োগ দেখেও এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় : 'এক কথায় বলিতে গেলে,' 'সেই ভাবনার

সমষ্টিই তো দর্শন'—এখানে 'তো' অব্যয়টি (আরো একবার প্রয়োগ করা হয়েছে) যেন বোঝায় যে তাঁর বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধ।

ইমোটিভ প্রোজ বা আবেগাত্মক গদ্যের আমরা একটা পৃথক বিভাগ করেছি। কিন্তু রচনামাত্রেই কিছু না কিছু আবেগ বহন করে থাকে। এখানে বিশেষভাবে কথাটা উল্লেখ করা হল, কারণ, দার্শনিক রচনা প্রায়শই আবেগধর্মী হয়ে থাকে এবং বর্তমান রচনায় লেখক তাঁর প্রস্তাবিত মায়াবাদ সম্পর্কে বেশ আবেগোত্থ; অন্ততো বৈজ্ঞানিকসুলভ নিরপেক্ষ নন। তথ্য-বিবৃতির উপলক্ষে তিনি যে সব অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করেছেন, তাতেই তা বোঝা যায়, যেমন, 'মনুষ্য সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না,' পদার্থ-বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁর প্রস্তাবিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়েই উৎপন্ন (৪র্থ অনুচ্ছেদ), এবং পঞ্চম অনুচ্ছেদে অনেকগুলি শাস্ত্রের নামোল্লেখের পর তাঁর মন্তব্য, 'যত কিছু মনুষ্যজাতির জ্ঞান-গৌরবের সমুজ্জ্বল নিদর্শন—সে সকলই তো, এই কার্যকারণ-ভাবনারূপ এক অকম্প্যভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত।'

যেমন রীতি-প্রকরণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দার্শনিকের মিল আছে, তেমনি অলংকার-প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। এই মাত্র যে অতিশয়োক্তির উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া 'অতীতের অব্যক্ত গর্ভ', 'তত্ত্বাবিষ্কারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র', 'ভাবনারূপ আলোক', 'ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় গহ্বর' প্রভৃতি রূপক লেখক হামেশাই ব্যবহার করেছেন।

উদ্ধৃত অংশটি 'মায়াবাদ' নামক একটি পুস্তিকার কথামুখ। মোট ছটি অনুচ্ছেদ নিয়ে এটি গঠিত। কিন্তু তবু এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এর তথ্যবিবৃতি, সৃষ্টিধর্মিতা, আবেগমর্মিতা ও কবিত্ব—সব মিলে অর্থবিস্তারের একটা ক্রম সূচিত হয়েছে, এবং আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট একটা প্যাটার্নও লক্ষ করা যায়। এর প্রথমাংশে প্রস্তাবনা, মধ্য অংশে আবেগোত্থ ভাব ও

কবিত্ব, আর শেষাংশে বক্তব্যের পরিণতি (দুই প্রান্তই তথ্যবিবৃতি ও বিশ্লেষণমূলক—মধ্য অংশের প্রকৃতি পৃথক): ছোট্ট পরিসরে অর্থচিত্রের একটা সম্পূর্ণতা লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে এটি সুলিখিত গদ্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন, সন্দেহ নেই।

পদ-প্রকৃতি, বাক্যগঠন ও ছন্দ-প্রবাহ সম্বন্ধে লেখক কোনো পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করেন নি বলেই মনে হয়—রচনাটির যে প্রকৃতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সে ক্ষেত্রে তা করলেই সেটি কৃত্রিম হত। কিন্তু প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যদি অর্থ-বিস্তারের ক্রম অনুসরণ করা যায়, তাহলে উক্ত উপাদানগুলির মধ্যে বেশ একটা পারস্পরিক সংগতি ও সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। যেমন, প্রথম দিকে লেখকের কণ্ঠস্বর মৃদু, তারপর উচ্চস্বরযুক্ত ও ধ্বনিমান হয়েছে, শেষের দিকে আবার স্বাভাবিকতায় নেমে এসেছে। প্রথম দিকে বাক্যগুলিতে কেবল বিশেষ্য আর ক্রিয়াই তাঁর প্রধান অবলম্বন; কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ অনুচ্ছেদে আবেগের উত্থানশীলতার সঙ্গে সংগতি রেখে এবং রচনায় বর্ণাঢ্যতা সঞ্চারের জন্য লেখক প্রায়ই বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, 'অতীতের অব্যক্ত গর্ভ', 'গৌরবের সামগ্রী', 'দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় গহ্বর', 'গভীর তত্ত্ব', 'সমুজ্জ্বল নিদর্শন', 'অকম্প্যভিত্তি' প্রভৃতি তার উদাহরণ। প্রথম দিককার পদগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্পাকৃত, কিন্তু তৃতীয় অনুচ্ছেদ থেকে শব্দগুলি সন্ধি-সমাস কিংবা তা ছাড়াই দীর্ঘায়ত এবং ধ্বনিকম্প্য (সোনোরাস) হয়েছে। লক্ষণীয় যে এই মধ্য অংশেই রচনার অর্থগৌরব সম্পাদনের জন্য লেখক অন্তত উনিশটি শাস্ত্র, নয় তো ঐতিহ্য-ঋদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নাম করেছেন।

বাক্যবিন্যাস ও অনুচ্ছেদ-গঠনের ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রথম অনুচ্ছেদটি মাত্র এক ছত্রের, চতুর্থটিই বৃহত্তম, তৃতীয় ও শেষ অনুচ্ছেদ প্রায় সমায়তন। প্রথম দিকের বাক্যগুলি ছোট এবং কাটা-কাটা, এই অংশের ছন্দও, অত্যন্ত মৃদু, স্বাভাবিক কথা বলার

রীতিকে পেরোচ্ছে না; কিন্তু চতুর্থ-পঞ্চম অনুচ্ছেদে বাক্যগুলি যেমন দীর্ঘ হয়েছে, তেমনি তার ছন্দস্পন্দও সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, সংগতি, সামঞ্জস্য ও সম্মিতি সম্বন্ধে যে কথা বলা হল, গঠনকলার সেই সব দিক থেকেও রচনাটি বেশ সৌষম্যযুক্ত॥

১২

এ পর্যন্ত বাঙালীর জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাওয়া গেল ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার সমর্থন কতটুকু পাওয়া যায়, তাহা এখন দেখা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ও পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির বিচিত্র ভাষার সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আনাম, মালয়, তালৈঙ্, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা, প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যে সব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ্ ও খ্মের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যেসব ভাষায় রচিত, সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত ভাষা-পরিবারের নাম অস্ট্রিক। একটু মনঃসংযোগ করিলেই ধরা পড়িবে, এইসব অধিবাসীরা সকলেই জন হিসাবে একই গোষ্ঠীর নয়। স্বতঃই অনুমান হয় ঐসব ভূখণ্ডে সন্ধান-সম্ভাব্য আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল এবং ইহারা প্রায় সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে কমবেশি অন্য জনের রক্ত সংমিশ্রণ হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে, এমন কি অনেক জায়গায় নূতন কোনও জন তাহাদের একেবারে আত্মসাৎও হয়তো করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন জনের ভাষা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং নানা জন-বিবর্তনের ভিতর দিয়াও সেই ভাষাপ্রবাহ আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

অনুমান হয়, আদি-অস্ট্রেলীয়দের ভাষাই হয়তো ছিল যাহাকে আমরা বলিতেছি অষ্ট্রিক। অষ্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি এক সময় উত্তর ভারতের অনেক স্থলেই ছিল। পরবর্তী যুগে দ্রবিড় ও আর্য ভাষা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে এই ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে; যেসব ক্ষেত্রে নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে তাহা সম্ভব [হয়] নাই, সেইসব স্থানেই কোনও মতে দ্বীপের মতন আশ্রয়ের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

উত্তর-ও পূর্ব-ভারতে সর্বত্র, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে, উড়িষ্যায়, বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, সীমান্তপ্রদেশে, বিশেষভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র আর্যভাষার প্রবল প্রতাপ। এই আর্যভাষার প্রধান রূপ সংস্কৃত; যাহা প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রাকৃত। এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইতে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। বাংলাভাষা তাহার মধ্যে অন্যতম। এখন, যদি একথা প্রমাণ করা যায় যে, এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের ভিতর অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদরচনারীতির প্রভাব আছে (নিছক অষ্ট্রিকরূপে অথবা সংস্কৃতকরণের ছদ্মবেশে) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অষ্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং এ তথ্যও ধরা পড়িবে যে, অষ্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আমরা আগে দেখিয়াছি তাহাপেক্ষাও তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক, আরও গভীর ছিল। ঠিক এই তথ্যটাই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, পশিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগচী-স্টেনকোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। ইঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতে-সংস্কৃতে হয় অষ্ট্রিকরূপে না হয় সংস্কৃত-প্রাকৃতের ছদ্মবেশে, বিশুদ্ধ প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচনারীতি আছে যাহা মূলে অষ্ট্রিক ভাষা হইতে গৃহীত। বাঙালীর ইতিহাসে এমন কতকগুলি শব্দ ও রীতির উদ্ধার করা যাইতে পারে, যাহা একান্তভাবে না হউক বহুলভাবে বাংলাদেশে ও বাংলার সংলগ্ন দেশগুলিতেই প্রচলিত। আদি

শুধু সেইসব শব্দই উদ্ধার করিতেছি যেগুলির সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য।[১]

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, ইতিহাস রচনা মিশ্র-শিল্প। ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করেন, তার সত্যতা যাচাই করেন এবং বিভিন্ন তথ্যের তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন—এদিক থেকে তাঁর কৃত্য বৈজ্ঞানিক-সুলভ। পক্ষান্তরে, ইতিহাসের তথ্যের জঙ্গল থেকে তিনি যখন নির্বাচন করেন এবং সেগুলিকে সাজান নিজের অভিপ্রায় অনুসারে, তখন তিনি কবি-সাহিত্যিকের মতো। তাছাড়া, ঐতিহাসিক তাঁর ভালো-মন্দ লাগা, বিস্ময়, হতাশা প্রভৃতি নিয়ে যেমন উপস্থিত থাকেন, ঠিক তেমনি পাঠকেরা ঐতিহাসিককে (বৈজ্ঞানিককে নয়) ঐ সব আবেগ সমেত ব্যক্তিপুরুষ রূপেও উপস্থিত দেখতে চান। এখন আমাদের দেখা দরকার তথ্যের ওপর তিনি কীভাবে সাহিত্যের রঙ এনে দিচ্ছেন, আবার সাহিত্যের রসায়নে ইতিহাসের তথ্য কীভাবে সজীব ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আমাদের আলোচ্য অংশে তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রথমটি খুবই ছোট, পরের দুটি বেশ বড়। লেখক প্রথম ছোট্ট অনুচ্ছেদটিতে বলে নিয়েছেন, তাঁর কৃত্য কী: 'ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণের' সাহায্যে তাঁর অভিপ্রেত 'বাঙালীর জনতত্ত্ব'-এর রূপ নির্ধারণ। কোন রীতিতে তিনি এগিয়েছেন, তা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম দুটি বাক্যের প্রতি নিবিষ্টলক্ষ হলেই বোঝা যাবে। অতি দীর্ঘ প্রথম বাক্যটিতে (একান্নটি শব্দ দিয়ে গঠিত) লেখক তিনটি বৃহৎ অঞ্চল (ভারতবর্ষ প্রভৃতি), আটটি 'ভূমি' (আনাম, মালয় প্রভৃতি) এবং দুটি গোষ্ঠীর

(তালৈঙ্ প্রমুখ) নাম করেছেন। আবার, দ্বিতীয় ছোট্ট বাক্যটিতে (আটটি শব্দ দিয়ে গঠিত) একটি সিদ্ধান্ত করেছেন, সেই 'ভাষা-পরিবারের নাম অস্ট্রিক'। এখানে ইতিহাসের তথ্যারণ্য বিশাল-বিস্তৃত, কিন্তু তাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তার ফলে, পাঠক সেই অরণ্যে দিশাহারা হতে না চেয়ে, ঐতিহাসিকের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকবেন এবং তাঁর বক্তব্যকেই আঁকড়ে ধরতে চাইবেন, কেন না, সেটাই সহজ।

তথ্য-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক এমন কিছু বিশেষণ ও অভিধা প্রয়োগ করেছেন, 'বিচিত্র ভাষা', 'বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা' ইত্যাদি—যার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, তিনি যে বহুল তথ্য দিয়েছেন, তাতেই তা নিঃশেষিত নয়। প্রকৃত পক্ষে তথ্যের বহুলতা এবং বিস্তৃতির ওপর লেখক বারেবারেই ঘুরে-ফিরে এসেছেন : হয়তো তাঁর লক্ষ পাঠকের বিশ্বাস্যতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। তৃতীয় অনুচ্ছেদেও লেখক একই রীতি অনুসরণ করেছেন—এখানেও তিনি দুটি অঞ্চল ও বারোটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন এবং দোহাই দিয়েছেন পশিলুস্কি প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ছ'জন পণ্ডিতের।

ইতিহাস রচনায় তথ্যের উপস্থাপনা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ঐতিহাসিকের সেই তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্ত বিচারসহ কিনা তাও লক্ষ করার বিষয়। বর্তমান রচনায় তথ্যের প্রাচুর্য আমরা আগেই লক্ষ করেছি, কিন্তু লেখকের সিদ্ধান্তসমূহ বিচারসহ কিনা সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসতে পারে। এখানে বিচার ও সিদ্ধান্তের স্তরগুলি মাঝে মাঝেই ছিন্ন হয়েছে দেখা যায় (এটা কি সেই আদিম যুগের আরও প্রাসঙ্গিক তথ্যের অভাবের জন্য ?)। মনে হয়, লেখক নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কিছুটা এগোবার পর তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন 'অনুমান হয়', 'সন্ধান-সম্ভাব্য', 'হয়তো', 'যদি প্রমাণ করা যায় যে' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ।

কিংবা, ইতিহাস-রচনায় জ্যামিতি বা ন্যায়শাস্ত্রের মতো বিচার-শৃঙ্খলা পর্যায়োৎসারিত হবে না, ঐতিহাসিক পুরুষের চোখে দেখাই পাঠকেরও চোখে-দেখা জিনিস হয়ে উঠবে। তাঁর অভিজ্ঞতা, ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সমেত তাঁর সিদ্ধান্তকে আমরা অনুসরণ করে যাব, যেমন সাহিত্যিকের রচনার ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি।

ইতিহাস-রচনা যেহেতু মিশ্র শিল্পরূপ, কাজেই ঐতিহাসিকের বিচার ও সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই; কেবল আমাদের দেখতে হবে সেটাকে তিনি কতখানি বিশ্বাস্য করে তুলতে পেরেছেন। এই উদ্দেশ্যে তথ্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এমন কতকগুলি অভিধা, বিশেষণগুচ্ছ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করেছেন, যা কোথাও আলংকারিক, কোথাও বা বর্ণনাকে রঙীন, কোথাও বা জোর দেবার প্রয়োজনে কল্পিত হয়েছে। 'একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে' (জোর দেওয়া), 'বিচিত্র ভাষা', 'বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা', 'প্রবল প্রতাপ', 'সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত' (অর্থ একই, পুনরাবৃত্তি রঙের পরিবর্তন আনা ও জোর দেওয়ার জন্য, 'সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত' সেই রকম), 'এমন অসংখ্য শব্দ' (ঠিক তথ্যানুগ নয়, আলংকারিক অতিশয়োক্তি) প্রভৃতি এই শ্রেণীর উদাহরণ।

গদ্যের মধ্যে অলংকার-প্রয়োগ তখনই সার্থক যখন তা বাচ্যার্থকে স্পষ্ট করে তোলে। সেদিক থেকে, 'দ্বীপের মধ্যে আশ্রয়ের মতন' উপমা হিসেবে উত্তম, কিন্তু 'এই ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে' রূপকটি বাচ্যার্থের ধারণাকে স্পষ্ট করে না এবং সেই জন্য কৃত্রিম। অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধ শব্দগুচ্ছ ঐতিহাসিক মাত্রেই প্রয়োগ করার চেষ্টা করে থাকেন, বর্তমান লেখকও করেছেন, যেমন, 'পশিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগচী-স্টেনকোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা', এবং 'বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ' ইত্যাদি।

যে কোনো সার্থক গদ্য-রচনায় প্রচলিত শব্দকে ঈষৎলক্ষ্য নতুন

রঙ দেওয়া বা নতুন শব্দ গঠন করা হয়।- সেদিক থেকে বর্তমান রচনাটিতে ভাষার মধ্যে একটা ঝরঝরে গতি এবং উজ্জ্বলতা দেখা যায়। 'সন্ধান-সম্ভাব্য' শব্দ-গঠন প্রশংসার্হ। 'স্বল্পসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হইয়া'—'বুলিতে' অর্থবহতার দিক থেকে চমৎকার, ভারী তৎসম শব্দ-সমূহের মধ্যে এই রকম হাল্কা কথ্য শব্দ ব্যবহার করে লেখক সাহসই দেখিয়েছেন। বাক্যের ক্রিয়াপদগুলিও বেশ জোরালো। সমস্ত অংশটির মধ্যে লেখক যে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব নিয়ে রয়েছেন, এগুলি তারই দ্যোতক। আর একটি কথা। আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে 'জনতত্ত্ব', 'জন হিসাবে একই গোষ্ঠীর নয়'—প্রভৃতিতে 'জন' অভিধাটি তিনি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সে অর্থেই 'নর' এবং সম্ভবত 'লোক' অভিধা দুটিও ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে পরিভাষাগত সমতা থাকা উচিত ছিল।

এই অংশের আর একটি লক্ষণীয় জিনিস, এর বাক্যগত দৈর্ঘ্য-বিষয়ক। এর অনেকগুলি বাক্য অতি দীর্ঘ, কতকগুলি সাধারণ ও স্বল্পাকৃত। ঐতিহাসিক রচনায় যেখানে বহু তথ্যকে একটা ঐকমুখীন দৃষ্টিতে গ্রথিত করে তুলতে হবে, সেখানে বৃহৎ বাক্য অপরিহার্য : আবার পরবর্তী বাক্যগুলিতে সিদ্ধান্তের উপস্থাপনার জন্য সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করতেও হয়। এতে অর্থবিস্তারের যেমন একটা তরঙ্গিত ভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি এতে আঙ্গিকগত সংহতি (art of compression) সৃষ্টিরও উদাহরণ মেলে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম দুটি বাক্যের কথা এই প্রসঙ্গে পাঠক ভেবে দেখতে পারেন॥

লোক-সাহিত্যের কোন লিখিত রূপের ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃত রস ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় না। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র যে কথাগুলি ছাপার অক্ষরে আমাদের চোখের সম্মুখে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বাংলার সুদূর উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী সেই অঞ্চলের কতটুকু রূপ ও রস নিজেদের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে? উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্তিমিত মশালের আলোকে সহস্র সহস্র পল্লীর নিরক্ষর শ্রোতা নগ্নগাত্রে কটিবাস মাত্র পরিধান ও তৃণাসন মাত্র সম্বল করিয়া গায়েনের মুখ হইতে যে মহুয়ার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে, তাহা যে তাহাদেরও বেদনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রাণহীন ছাপার অক্ষরগুলি কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? লোক-সাহিত্য প্রাণ দিয়া যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রাণ ঢালিয়াই ইহার প্রচারও হয়। গায়েনের চোখে জল দেখিয়া শ্রোতার চোখে জল গড়াইয়া পড়ে, শ্রোতার চোখে জল দেখিয়া গায়েনের চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠে। এই অশ্রু দুঃখেরও যেমন হয়, আনন্দেরও তেমনি হইতে পারে। হৃদয় অধিকার করিবার শক্তিই লোক-সাহিত্যের শক্তি; এই শক্তি কাগজে কলমে কি করিয়া ফুটিবে? অতএব লোক-সাহিত্যের লিখিত কোন রূপের ভিতর দিয়া ইহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় না; সুতরাং ইহার সাহায্যে ইহার নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রচার-লাভেরও কোন সহায়তা হইতে পারে না।[১]

রচনাংশটির প্রথম বাক্যটির ওপর দৃষ্টিপাত করলে পাঠক দেখবেন, লোক-সাহিত্যের 'লিখিত' রূপের মধ্য দিয়ে তার 'প্রকৃত রস' ফুটিয়ে তোলা যায় না, লেখক এই যে প্রস্তাবটি করেছেন,

অংশটির শেষ বাক্যের অর্থরূপের মধ্যে সেটিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সিদ্ধান্তে পৌছোতে গিয়ে লেখক যে রীতি অনুসরণ করেছেন, তা একই সঙ্গে নৈয়ায়িক ও কাব্যিক। নৈয়ায়িকতার ক্রমগুলি সুস্পষ্ট : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র মতো সাহিত্য একটি বিশেষ অঞ্চলের লোক-জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত, যে লোকজীবন আবার সমসত্ত্ব (homogenous)—তাদের দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতার একই মানদণ্ডে। গায়েন এবং শ্রোতাও সমপ্রাণ, কেননা উক্ত সাহিত্যের প্রস্তাবিত বিষয়ও (যেমন, 'মহুয়ার দুঃখের কাহিনী') তাদেরই জীবনের কথা। সুতরাং 'লিখিত রূপ'-এর মতো আধুনিক সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সাহিত্যিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে লোক-সাহিত্যের প্রচার সম্ভব নয় ('প্রচার' কথাটি দিয়ে লেখক মনে হয় হৃদয়-সংবেদ্যতা বা communication বোঝাতে চেয়েছেন)।

লেখকের এই নৈয়ায়িক রীতি পোষকতা লাভ করেছে, তাঁর কিছু অনুক্ত অথচ ব্যঞ্জিত তথ্যের দ্বারা। অংশটি পড়তে পড়তে পাঠক স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারেন, আধুনিক লিখিত সাহিত্য জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়, একান্তই ব্যক্তিগত : প্রচার বা communication দূরস্থিত, কেননা পাঠক ও লেখক সাহিত্যের আস্বাদনের সময় একত্রাবস্থান করেন না ; কোনো লেখক (=গায়েন) স্বচ্ছন্দে উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা ধনী হতে পারেন কিন্তু লিখতে পারেন দরিদ্র শ্রমিক-কৃষককে নিয়ে। সুতরাং এই অনুক্ত বৈপরীত্য বা contrast-এর দ্বারা তাঁর নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছে, মনে করতে পারি।

লেখকের রচনা-রীতির নৈয়ায়িকতার সঙ্গে কাব্যিকতার কথাও বলেছি। চিত্রধর্মিতা কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। পাঠক লক্ষ করবেন, প্রকৃত লোক-সাহিত্যের আসর ও পরিবেশের গায়েন ও শ্রোতা, তাদের সমপ্রাণতা, সব কটি দিকই ছবি এঁকে তিনি কতটা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন : 'উন্মুক্ত আকাশ', 'স্তিমিত মশালের আলোক',

'নগ্নগাত্রে কটিবাস মাত্র পরিধান ও তৃণাসন মাত্র সম্বল', গায়েন ও শ্রোতার 'নীরবে অশ্রুপাত' প্রভৃতি সেই সব চিত্রের কয়েকটি উদাহরণ। একটু আগে আমরা আধুনিক সাহিত্য-রীতির যে বৈপরীত্যের কথা বলেছি, সেটি পরোক্ষ পটভূমিতে থেকে এই চিত্র-গুলিকে উজ্জ্বল করেছে।

ভাষার মধ্যে অনুষঙ্গ-সৃষ্টির একটা প্রবণতা অংশটির মধ্যে লক্ষ করা যায়, যা ঐ একই কবিধর্মের পোষকতা করেছে। 'যে কথাগুলি ছাপার অক্ষরে আমাদের চোখের সম্মুখে' ইত্যাদি অংশ মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি, 'হায়রে, কানে শোনার কবিতাকে পরানো হল চোখে দেখার শিকল' ইত্যাদি। 'উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্তিমিত মশালের আলোকে' রোম্যান্টিক ভাবকল্পনায় বহুবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'নগ্নগাত্রে কটিবাস মাত্র পরিধান ও তৃণাসন মাত্র সম্বল' বিবেকানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

লেখক অংশটিতে প্রচলিত কোনো অলংকার ব্যবহার করেন নি। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি প্রশ্ন-চিহ্ন দিয়ে তাঁর বাক্য শেষ করেছেন। এগুলি কাকু-বক্রোক্তির সৃষ্টি করে তাঁর বর্ণনাকে কতকটা সজীব করে তুলেছে, সন্দেহ নেই।

অংশটির ভাষারীতি সাধু, যদিও বিশেষ করে সংস্কৃতরীতি-ঘেঁষা নয়। বহুল তৎসম শব্দের সমাবেশ আছে কিন্তু ধ্বনিস্পন্দ উচ্চাবচ-সংস্থিত নয়, হালকা চালেরও নয়, মসৃণ, ঈষৎ গম্ভীর। বাক্যাংশগত অর্থবিভাগগুলি যেমন বড়, তেমনি বাক্যগুলিও দীর্ঘ। এতে লেখকের সাবহিত মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বোল্লিখিত নৈয়ায়িকতার সঙ্গে সমঞ্জসীভূত হয়ে এই বাক্যগুলি একটি মাত্র ভাবগ্রন্থিবিশিষ্ট অনুচ্ছেদে সংগঠিত হয়েছে॥

১৪

মোটের উপর এই সংশয়াচ্ছন্ন যুগের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আধুনিক কবিরা যে দিশাহারা হলেন তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (sense of negation), অগ্রজের আপ্তবাক্যে ও ঐতিহ্যগত আদর্শে অবিশ্বাস (loss of faith), রৈখিক প্রগতি নয়, চক্রাকার আবর্তনই একমাত্র সত্য, এরকম বোধ ('সৃষ্টির রহস্যমাত্র আলিঙ্গন পুনরালিঙ্গন'—সুধীন্দ্রনাথ) কবিদের মনে দেখা দিলো। কাল (time) আর প্রবহমান ধারা রূপে প্রতীয়মান হ'লো না। কালের চিত্র আধুনিক কাব্যে হ'য়ে দাঁড়ালো পিকাসোর ছবির মতো, এক মুহূর্তে তাঁরা দেখলেন বর্তমান ও ভবিষ্যতকে। প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টার মতো ভাবনাও এক চিত্রকল্প থেকে আর-এক চিত্রকল্পে, এক স্তর থেকে আর-এক স্তরে উল্লম্ফন করতে লাগল। তার ফলে, ভ্যালেরির ভাষায়, দেখা দিলো এক Semantic disturbance অর্থাৎ বাক্যের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধচ্যুতি। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নবিশ্লেষণ কেবল প্রেমের অতীন্দ্রিয় আদর্শকেই ধ্বংস করল না, আধুনিক কাব্যের আঙ্গিকও বদলে দিলো। স্বপ্নে যেমন কোনো যোগসূত্র থাকে না, কতকগুলো এলোমেলো চিত্রকল্প ভেসে বেড়ায়, তেমনি কবিতার রাজ্যেও ঘটল। ভাষা থেকে ব্যাকরণের শৃঙ্খল খ'সে পড়ল, চিত্রকল্পের যুক্তিগ্রথিত পারম্পর্য (logical sequence)-এর স্থলে দেখা দিলো আবেগগ্রথিত পারম্পর্য (emotional sequence)। অনেকগুলো অবদমিত কামনা যেমন একটি ব্যঞ্জনায় সংহত হয়, তেমনি কাব্যের রাজ্যেও ভাবের সংক্ষিপ্তকরণ দেখা দিল। স্বপ্নে যেমন একটি জিনিসের বদলে আর-একটি জিনিস দেখা দেয় কাব্যেও দেখা দিলো সেরকম স্থানচ্যুতি (displacement)। সেখানেও যেমন অনুষঙ্গের (association) প্রক্রিয়া কাজ করে, কাব্যেও তেমনি অনুষঙ্গের নীতি অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন ধারণা বা চিত্রকল্প পর-পর উদিত হ'তে লাগল। স্বপ্ন-রাজ্যের প্রতীকের যেমন একটি মাত্র অর্থ হয় না, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অর্থ হ'তে

থাকে, কাব্যেও সেরূপ বিচিত্র দ্যোতনা দেখা দিলো, যাকে বলা হয়েছে ambiguity।[১]

সাহিত্য-সমালোচনা নানা আদর্শের হতে পারে, বিশেষ করে কাব্যের। চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণ, কাব্য-রচয়িতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ, তত্ত্ব-দর্শনের আবিষ্কার বা আরোপ করা, ছন্দ-অলংকার-ভাষাচিত্রের আলোচনা, সমাজতাত্ত্বিক-প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমির পরিচায়িকা এমনি নানা রকম।

সমালোচনার বর্তমান উদ্ধৃত অংশটির প্রতি এক নিমেষের লক্ষপাত করলে, এর একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ কালিদাস-সমালোচনাগুলি যেমন পুনর্গঠিত ও সৃষ্টিধর্মী, এটিও কতকটা সেই শ্রেণীর।

লেখিকা যদিও এখানে 'সংশয়াচ্ছন্ন যুগ' ও 'দিশাহারা কবি'-দের সম্বন্ধে বলবার প্রস্তাব করেছেন তবু স্বভাবতই তাঁর লক্ষ পাঠক-সম্প্রদায় আর বিষয় হচ্ছে আধুনিক কবিতা। লেখিকা বর্তমান অংশে আধুনিক কবিতার যে লক্ষণ নির্দেশ করতে চেয়েছেন, তাঁর লেখার মধ্যে সেই লক্ষণগুলিই ফুটে উঠেছে। তাঁর রচনা অনুসরণ করতে গিয়ে পাঠককে 'এক স্তর থেকে আর-এক স্তরে উল্লম্ফন করতে' হয়। যেমন, তিনি বাংলা ভাষায় বাংলা কবিতার সমালোচনা করছেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এই ছোট্ট রচনাংশটির মধ্যেই ন'টি পরিভাষা-সূচক ইংরেজি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন—সেক্ষেত্রে পাঠককে অন্ততো ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যের আর এক স্তর সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। তাছাড়া, দেশী-বিদেশী কবি-শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ

(উদ্ধৃতি সমেত), পিকাসোর ছবি, প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টা, ডারেল ও ফ্রয়েডের মনোবিকলনের কথা উল্লেখ করেছেন অবলীলাক্রমে এবং এঁদের মধ্যে ফাঁক না রেখে। এঁরা প্রত্যেকে পৃথক জগতের মনীষী এবং এঁদের রচনা বেশ আয়াসাধিগম্য। সুতরাং লেখিকার বক্তব্য অনুসরণ করতে গিয়ে বৈচিত্র্য-বিরোধপূর্ণ বিভিন্নমুখ কঠিন মানস-প্রয়াসের প্রয়োজন। শেষত, তিনি যেসব ধারণা বা কন্‌সেপ্টের কথা বলেছেন, যেমন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আপ্তবাক্য, ঐতিহ্যগত আদর্শ, রৈখিক প্রগতি বনাম চক্রাকার আবর্তন, কাল সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, চিত্রকল্প, ব্যাকরণ ও কবিভাষা, স্বপ্নবিশ্লেষণ, দ্যোতনা, অনুষঙ্গ ও অবদমিত কামনা ইত্যাদি—তার তালিকাও মোটেই কম নয়।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, লেখিকার রচনার মধ্যেই সেই লক্ষণ আছে, যা তাঁরই নির্দেশিত আধুনিক কবিতার প্যাটার্নকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। এদিক থেকে রচনাটি নিশ্চিতই সৃষ্টিকর্মের লক্ষণাক্রান্ত।

নিঃসন্দেহে, যাকে বলে সুগঠিত অনুচ্ছেদ, এটি তারও একটি উদাহরণ। বিভিন্ন বাক্যকে অবলম্বন করে অর্থবিস্তারের এক-একটি তরঙ্গ এখানে একটি সজীব ঐক্যে নিটোলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কোনো একটি সুগঠিত অনুচ্ছেদের মূল বাক্যটি সাধারণত প্রথমে বা শেষে থাকে। আমার মনে হয়, বর্তমান উদাহরণে সেটি রয়েছে প্রথমেই; এবং সেটির যা অর্থ, অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যে, বিশেষ করে শেষতম শব্দ 'ambiguity'-তে তার প্রতিধ্বনি রয়েছে।

প্রথম বাক্যে লেখিকা তাঁর উদ্দেশ্য-বিবৃতির পর, যে দ্বিতীয় বাক্যটি ব্যবহার করেছেন, সেটি দীর্ঘতম। বাক্যটির গঠন যদি লক্ষ করেন, তাহলে পাঠক দেখবেন অর্থবিস্তার এবং ছন্দ-প্রবাহ বারবার ভেঙেছে, নানা বিরোধী প্রসঙ্গ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি পরিভাষা ও বন্ধনীস্থ উদ্ধৃতির জন্য—কিন্তু সব মিলে বাক্যের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। পাঠকের দিক থেকে এখানে অতিরিক্ত মানস-প্রয়াস আবশ্যক।

লেখিকার প্রস্তাবিত বিষয়ানুগ বিচিত্রমুখ জটিলতার একটা দ্যোতনা এখানে বাহিত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যগুলিতে এতটা হোঁচট খেতে হয় না, কিন্তু লক্ষণীয়, বিরল এক-আধটি বাক্য ছাড়া কোনো বাক্যেই সরলভাবে লেখিকা একটি মাত্র বিষয়ের কথা বলেন নি। বারবার তিনি যে কৌশলটি অবলম্বন করেছেন সেটি হচ্ছে এ্যানালজি বা সাদৃশ্য-কথন, যাতে একই সঙ্গে একাধিক বিষয়কে তিনি সমগ্রথিত করেছেন। আধুনিক কবিতার বহুস্তর অর্থদ্যোতনার বৈশিষ্ট্য লেখিকার এইরূপ বাক্যগঠনের প্রবর্তনাকে উদ্রিক্ত করেছে—এরকম মনে করা যায়?

অথচ, যে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, লেখিকা অবলীলাক্রমে এই কঠিন জালবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। কোথাও কষ্টপ্রয়াসের চিহ্ন বা কৃত্রিমতার পরিচয় নেই। জটিল বিষয়ের অবতারণায় এই রকম সহজতা-সৃষ্টি নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক। অংশটি চল্‌তি ভাষায় রচিত, এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে এই জন্যে যে ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপটির ওপরেই তা নির্ভর করে না। প্রয়োজনীয় তৎসম শব্দ (তাদের মধ্যে অনেকগুলি ভারযুক্ত, সন্ধি-সমাসের দ্বারা দীর্ঘায়ত শব্দও আছে) ব্যবহারের ফলে কথা বলার সজীবতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। 'দেখা দিলো', 'হয়ে দাঁড়ালো', 'বদলে দিলো'--এই রকম ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ফলে, মনে হয়, কবিতার পটভূমি পরিবর্তনের বিচিত্র এবং বিভিন্ন সমসাময়িক প্রক্রিয়াগুলিকে তিনি যেন গল্পের আঙ্গিকে বর্ণনা করছেন, যেন চোখের সামনেই তা ঘট্‌ছে। (কিন্তু, একটা কথা, এই সব ক্রিয়াপদের 'ও'-কারান্ত বানান কেন? উচ্চারণ কি পুরোপুরি ও-কারান্ত?—বানানটা চোখে লাগে স্বীকার করতেই হয়।)

ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলার আছে। লেখিকা প্রায়ই যৌগিক বা সংযোগমূলক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, যাতে

ক্রিয়ার প্রসার ও বাক্যসমাপ্তির বলিষ্ঠতা সূচিত হয়। তাছাড়া ক্রিয়াপদগুলি সর্বত্রই তিনি বাক্যের শেষেই ব্যবহার করেন নি, তাতে রচনাটি অন্ততো একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পেয়েছে ॥

অনুশীলনীর জন্য

ঘ

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল, শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল

তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্ম্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।[১]

৬

ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ রোম সাম্রাজ্যের উপরিস্তরে বর্ব্বর জাতীয়দিগের অবস্থান, ভারতবর্ষে বর্ব্বরদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় লোকের উপরিভাগে আর্য্যজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রজোগুণাত্মক লোকের প্রাধান্য, ভারতবর্ষে সত্ত্বগুণাবলম্বীর প্রাধান্য। কিন্তু তজ্জন্য ভারতবর্ষের পরিণতি ব্যাপারে পশ্চাদ্বর্ত্তিতা সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ভারত-সমাজের পরিণতি ভিন্নপথে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্যে এখানেও যোদ্ধৃদশা জাজ্বল্যমান, সকল ইউরোপীয় লোকই সিপাহী সাজিয়া উঠিয়াছে, রাজস্বের অর্দ্ধাংশ সৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। ভারত-সমাজের ঐ ভাব যদি কখন হইয়া থাকে তবে যখন একটি স্বতন্ত্র যোদ্ধৃ-জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয়াছে—ইউরোপের সকল লোকই ভোগ-সুখ-লালসায় প্রপীড়িত রহিয়াছে, ভারত-সমাজের ঐ অবস্থা চতুরাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই—ইউরোপের সাধারণ লোকে এখনও সাতিশয় নিষ্ঠুর স্বভাব এবং অকারণ প্রাণিবধে উদ্যতহস্ত। ভারত-সমাজে যখন অহিংসাই পরম ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন হইতেই ঐরূপ স্বৈরাচার গিয়াছে; ইউরোপ অপর সমুদায় ভূ-ভাগকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছেন, পরের ছেলের মুখের গ্রাস নিজের ছেলেকে খাওয়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যদি কখনও ঐভাব দেখা দিয়াছিল এমত হয়, তাহা বহুকাল হইতে তিরোহিত

হইয়াছে। ভারতবাসী অন্যের অন্নে ভাগ বসাইতে চাহেন না। এ সমাজের সহিত এমন সকল বিষয়ে ইউরোপীয় সমাজের তুলনা হইতে পারে না। তবে ইউরোপের কল-কারখানা বাড়িয়াছে এবং ইউরোপ বিজ্ঞান-বিদ্যায় এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্বাঙ্গীণতা বা পূর্ণতাই উৎকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাজের সর্বপ্রধান কর্তব্য, অর্থাৎ সমধিকসংখ্যক লোকের সুপালনে, ভারতসমাজ পৃথিবীর অপর কোন সমাজের অপেক্ষায় ন্যূন ছিল না—এখনও ইউরোপ অপেক্ষা ন্যূন হয় নাই।[১]

সূর্যের গায়ে এই যে সব কালো দাগ দেখা যায় তাদের মূলে রয়েছে তার ভিতরকার অগ্নিকাণ্ডের তুমুল তোলপাড়। প্রচণ্ড উত্তাপে সূর্যের উপরিতলের পদার্থপুঞ্জ ক্রমাগত আলোড়িত হচ্ছে, কিন্তু তার অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ও চাপ অত্যধিক হওয়ায় সময় সময় ভিতরকার উত্তপ্ত বাষ্পপুঞ্জ উপরকার আলোড়িত পদার্থকে ভেদ করে কুণ্ডলী আকারে ঘুরতে ঘুরতে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরের আবরণে তখন প্রকাণ্ড আবর্তের গহ্বর সৃষ্টি হয়; এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আম্ব্রা (Umbra), তার চারদিকে অপেক্ষাকৃত কম কালো একটি বেষ্টনী যার নাম পেনাম্ব্রা (Penumbra)। সূর্যের ভিতরকার উত্তপ্ত পদার্থ যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তার উপর থেকে চাপ কমে যেতেই প্রসারিত হয়ে তা ঠাণ্ডা হোতে থাকে। তাপ কমতেই তার দীপ্তিও কমে, তখন সেই অংশ চারদিকের উদ্দীপ্ত অংশের তুলনায় কালো দেখতে হয়। এই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল অংশের আলো যদি বন্ধ করা যেত তাহলে অতি তীব্র দেখা যেত এই কালো দাগের জ্যোতি। সূর্যের বহিরাবরণ ভেদ করে যে-বাষ্পপুঞ্জ বাইরে বেরিয়ে আসে, অনেক সময় তা সূর্যের দেহ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হয়; সূর্যগ্রহণের সময় দেখা যায় এই জ্বলন্ত বাষ্প অগ্নিশিখার

(Solar prominence) মতো সূর্যের পরিধি অতিক্রম করে বহুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ঘণ্টায় প্রায় তিন লক্ষ মাইল পথ পার হয়ে যায় এত প্রচণ্ড এর গতি। এই উত্তপ্ত বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে থাকে পরমাণু ও পরমাণুভাঙা বিদ্যুৎকণা; সূর্য থেকে ছাড়া পেয়ে এই সব বিদ্যুৎকণা প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির প্রভাবে এরা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে ধাবিত হয়, তখন তাদের প্রচণ্ড সংঘাত ঘটে হাওয়ার অণুর সঙ্গে; ফলে হাওয়ার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তার থেকে সৃষ্টি হয় নানা রঙের আলো। এই আলোই মেরুজ্যোতিঃ (Aurora) নামে পরিচিত। এই যে বিরাট আয়তনের সূর্য, যার মধ্যে নিরন্তর চলেছে প্রলয়ংকর অগ্নিকাণ্ড, তাকে আমরা দেখি ছোটো একখানি থালার মতো, কিন্তু তার অগ্নিআবর্তের তুমুল আলোড়নের কোনো খবরই বাইরে থেকে জানতে পারি না।[১]

ছ

সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক ও থুতু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয় তেমনি তাঁদের কুৎসিত আচরণের কু-আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের মধ্যে এক দল আছেন যাঁরা কলাচর্চায় বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরই একমাত্র অধিকার বলে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে নির্বাসিত করে রাখতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সুষমাই শিল্পের প্রাণ, অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার চলে না। গরিব সাঁওতাল তার

মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার, কলেজে-পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামি কাপড়-জামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে জবড়জঙ্গ করে রাখে। এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, ধনী সন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোশাকি এবং প্রাণহীন। শিল্প-উপাসনার নামে ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভালো ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই। ছাত্রমহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে—পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আর্শি, চিরুনি ও কোকোর টিনে কাগজের ফুল সাজানো। প্রসাধনে কাপড়ের উপর বুকখোলা কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবি ক্ষুরওলা জুতো—এরূপ সর্বত্রই সুষমার অভাব, আমাদের বিত্ত থাক্ আর না-থাক্, সৌন্দর্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।[১]

জ

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা তোলা যাক্। আমরা বাঙালি গতিশীলতার গর্ব করতে পারি। দূর অতীতে আর্যীকরণ সময় থেকে ভারতীয়তার যা ভালো আমরা আত্মস্থ করেছি, ইসলাম এবং বিশেষভাবে সুফি-মতবাদ যখন এল জড়বৎ থাকি নি, আবার য়ুরোপীয় ভাবধারায় অভিস্নাত হয়ে আত্মবিকাশের পথ খুঁজে নিতে বিলম্ব করি নি। কিন্তু ইংরেজ? যারা দু'শ' বৎসর আমাদের সঙ্গে কাটাতে বাধ্য হয়েছে তাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে ভারতীয়তার প্রকাশ কই? তাদের সাহিত্যে ভাববিপ্লব আনতে পারে এমন নূতন এবং গ্রহণীয় কিছু কি আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে নেই? ভারতীয় ভাবরসিকতা ও স্বপ্নদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কের কিছু মৌখিক ভাষণ এবং কোনও কোনও মনীষীর লিখিত গ্রন্থও যে নেই এমন নয়। কিন্তু য়ুরোপীয়, বিশেষভাবে ইংরেজদের কাব্য-সংস্কারে তা আঘাত দিয়ে নূতন পথ উন্মুক্ত করেছে এমন প্রমাণ নেই কেন? কোনও কোনও ঔপন্যাসিকের লেখায় ভারতীয় বাবুর্চি অথবা

বাবু বাঙালি অথবা শিখাধারী হিন্দুস্থানীর চিত্রই কি তাদের ভারতীয় সম্পর্কের নিদর্শন? আসলে ইংরেজেরা স্বকীয় ভাব-সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন ক'রে রয়েছে, তারা রক্ষণশীল। প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দে জার্মানীতে যে দার্শনিক নব ভাবুকতার প্রসার ঘটিয়েছিল তা থেকেই পশ্চিমের রোমান্টিক নবজাগরণের উদ্ভব, এমন কথা মাননীয় হ'লেও, এর চেয়ে প্রত্যক্ষতর সম্পর্কে সে-ভাব স্থায়ী এবং বিচিত্র হ'ল না কেন তা-ই বিবেচ্য।[১]

ঝ

বাংলাদেশের চতুঃসীমার মধ্যে যে ভাষার বিবর্তন হয়েছে, যা বাঙালীর হাজার বছরের চৈতন্যপ্রবাহ বহন করে চলেছে, সেই বাংলাভাষার উৎসস্থল সংস্কৃত সন্দেহ নেই। গিরিদরী থেকে যখন ক্ষীণ ধারায় জলস্রোত নেমে আসে, তখন তাকে দেখে কি মনে হয়, এই শীর্ণ তোয়প্রবাহ ক্রমে সমতল-ভূমিকে প্লাবিত করে প্রবল বিক্রমে, প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে, দিগ-দিগন্ত কাঁপিয়ে সমুদ্রে মিলিত হবে? বাংলা ভাষার উৎপত্তি অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার মতোই নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদীপ্রবাহের মতোই এ ভাষা কালানুক্রমিকভাবে যত অগ্রসর হয়েছে, ততই এর পরিবর্তন হয়েছে, ততই এর আকার-আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর এই বিংশ শতাব্দীতে এ ভাষা সহস্রমুখী হয়ে চলেছে নব নব সম্ভাবনার সাগরসঙ্গমে। অবশ্য সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও ভাষার বিচারে অখণ্ডতাই আমাদের লক্ষ্য। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, এদেশে আর্যাভিযানের পূর্বে-অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ জাতি বাস করত। কালক্রমে এদেশে আর্যসংস্কার দৃঢ়মূল হল, আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা বাঙালীর কর্ণগত হল, তারপর স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাও এদেশে প্রচলিত হল—এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে বাংলা ভাষা ভূমিষ্ঠ হল—অবশ্য এ তারিখ আরও কিছু

পেছিয়ে যেতে পারে। এখন বাংলা ভাষার পরিণতি-প্রবাহ ধরে উৎসমুখে এগিয়ে যাওয়া যাক।[১]

এও

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে সমাজের অবস্থাও বিবেচ্য। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। তার আগে সিনিয়র শ্রেণীতে তিনি হুগলী কলেজে পড়েছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা দিলেন। বি-এ পরীক্ষা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে যশোহর চলে যান। তারপর থেকে তাঁকে মেদিনীপুর খুলনা বারুইপুর মুর্শিদাবাদ বারাসত হুগলী হাবড়া বাবাসত যাজপুর ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে চাকরী উপলক্ষে ঘুরে বেড়াতে হয়। মাঝখানে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এ্যাসিসটাণ্ট সেক্রেটারীরূপে অস্থায়িভাবে কয়েক মাস কাজ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম প্রধানত মফঃস্বলেই হয়েছিল। সেকালে কলকাতায় যে সব আন্দোলন চলেছে তার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ কিছু ছিল না। তাঁর রচনার মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের উল্লেখ অথবা মন্তব্য বিরল। তাঁর প্রবন্ধে সাংবাদিকতার লক্ষণ নেই। মানুষের যে ভাবনা নিত্যকার তাই বঙ্কিমকে অধিকার করেছিল। মূল শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সাহায্যে তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এ জন্য মনে হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বইঘেঁষা। অবশ্য ইংরেজিতে যাকে scholarly ও বাংলায় যাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে সে-আলোচনা বইঘেঁষাই হয়ে থাকে। সাংবাদিকতাধর্মী না হওয়াই তার গুণ। অনেকেই যখন সম্প্রদায়-গঠনে ব্যস্ত কিংবা সমাজ সংস্কারে মনোযোগী বঙ্কিমচন্দ্র তখন মনুষ্যত্বের ধ্রুব আদর্শ সন্ধানে নিরত। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান্ বলিষ্ঠ মানুষ জীবনের কর্তব্য স্বাধীনভাবেই নির্ণয় করে নিতে পারে, সেই জন্যই যেন মনুষ্যত্বের মূল উপাদানগুলি কি তিনি তারই সন্ধান করছিলেন। তিনি কর্মী পুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন চিন্তাশীল মনীষী।[২]

আবেগাত্মক গদ্য

১৫

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে

পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।[১]

অংশটি 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের উপসংহার: প্রতাপের মৃত্যুই এই অংশের কেন্দ্রীয় ঘটনা। প্রধানত রমানন্দ স্বামী এবং প্রতাপের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং সেই সূত্রে লেখকের কিছু মন্তব্য এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আবেগ-জাগানো গদ্যের এটি এক চমৎকার নিদর্শন। যে কোনো মৃত্যুই এ ব্যাপারে সহায়ক, আর এখানে তো প্রতাপের মতো মহৎ নায়ক-পুরুষের মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া পরিবেশটিও অতীত কালের, যখন প্রেম, বীরত্ব, শৌর্য, আত্মত্যাগ মহৎ মূল্যে স্বীকৃত হত। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বীর প্রতাপ, অনন্যা প্রেমিকা শৈবলিনী, মৃতদেহবিকীর্ণ যুদ্ধোত্তর রণক্ষেত্রের দৃশ্য সব মিলে পাঠকের চিত্তকে স্বতই আবেগোত্থ করে তোলে।

এ অংশের নাটকীয় গ্রন্থন-রীতিও একই উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়েছে। রমানন্দ স্বামী ও প্রতাপের উক্তি-প্রত্যুক্তির জন্যেই নয়, একটা নাট্য-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতাপের মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নাটকীয় বৈপরীত্য (dramatic contrast)-সৃষ্টি আশ্চর্য কৌশলপূর্ণ। 'সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল।…'

এই ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের বলিষ্ঠ সংরাগপূর্ণ প্রেমের একটি অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কিছু পরেই, 'ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল।'—এটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

কেবল নাটকীয়তার জন্যও নয়, লেখক কৌশলে প্রতাপের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পূর্বতন ঘটনাবলীর নির্যাসটুকুও এই অংশে ঢেলে দিয়েছেন। সংহতি (intensity) সৃষ্টির এও সুন্দর উদাহরণ। আঙ্গিক-রচনার অন্যান্য দিকগুলিও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। এখন সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

প্রতাপের মৃত্যুকে লেখক এখানে এক অত্যুন্নত মহিমায় ভাস্বর এবং সেই সঙ্গে পাঠকের চিত্তকে আবেগারূঢ় করে তুলতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রথমেই যে কৌশলটি অবলম্বন করতে চেয়েছেন, সেটি হচ্ছে অতিশয়োক্তির প্রয়োগ—যা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। আনন্দবেদনামুক্ত বৈরাগী, সন্ন্যাসী 'রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল', এটি অতিশয়োক্তির প্রথম উদাহরণ। তারপর, 'ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না', 'শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে', 'মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ ; শাস্ত্র এখানে মূক', 'দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী', এবং সর্বশেষ, 'লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না'—এই রকম অতিশয়োক্তির উদাহরণ রচনাটিতে অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে।

আবেগ-জাগানো গদ্যের একটা বহু-ব্যবহৃত, সহজলভ্য উপকরণ হচ্ছে এমন সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আহরণ করা, যার সঙ্গে বহুদিনের ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গ জড়িত। লেখক এখানে সেটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসা, 'পরহিতব্রতধারী', 'অক্ষয় স্বর্গভোগ', 'ব্রহ্মাণ্ডজয়', 'ভালবাসা', 'পাপচিত্ত', জীবনবিসর্জন',

'জ্ঞানী', 'শাস্ত্রদর্শী', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'জগদীশ্বর', 'চিত্তসংযম', 'পরোপকার', 'দধীচি', 'অনন্তধাম'—এই সমস্ত অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধ শব্দ পাঠককে সহজেই ভাববিগলিত করে তোলে।

এপিগ্রাম বা বিরোধমূল জাতীয় অলংকার পাঠকের বোধকে প্রথমে নাড়া দিয়ে বিপর্যস্ত করে তারপর তাকে সক্রিয় ও উৎপ্রতিষ্ঠ করে তোলে। এই রকম উদাহরণ অংশটিতে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। যেমন, 'সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল', 'আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা', 'যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই' এবং 'লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না'।

শুধু তাই নয়, এখানে অন্যান্য অলংকারগুলিকেও লেখক উপযুক্ত সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র'—এটি প্রতিবিন্যাস আবার ব্যতিরেকেরও উদাহরণ। এই রকম 'ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না', 'যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী', 'মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না', 'তৃণশয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল' ইত্যাদি। প্রতিবিন্যাস বা ব্যতিরেকের দ্বারা প্রতাপ সম্বন্ধে লেখক আমাদের মহত্ত্বের বোধজনিত আবেগ ও বিস্ময়কে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

লেখক এই অংশে একটি মাত্র রূপক ব্যবহার করেছেন, 'অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু'—সেটিও আবার রূপকাতিশয়োক্তি। আবার কোনো কোনো অংশে ঠিক বিশিষ্ট রূপক নয়, কিন্তু তার ভাবপ্রেরণা কাজ করেছে, যেমন, 'রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য' ইত্যাদি। এ সব লেখকের উক্ত একই উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়েছে।

গদ্যে বিশেষণ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল বস্তুকে একটা পরিচ্ছিন্ন

রূপ দেওয়া। কিন্তু আবেগ-জাগানো গদ্যে বিশেষণগুলি প্রচুর পরিমাণে থাকলেও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় না। বিশেষণ-প্রয়োগের প্রাথমিক কাজ খানিকটা করেও সেগুলি আবেগ-জাগানো ও বর্ণনায় বর্ণাঢ্যতা সঞ্চারের কাজই করে থাকে। 'অখণ্ড অক্ষয় স্বর্গভোগ'—এর একটি বিশেষণেই কাজ চলত (বিশেষ করে দুটিই যখন সমার্থক) কিন্তু অন্যটিও অপ্রয়োজনীয় নয়ঃ আবেগের প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ ও দীর্ঘায়ত রাখতে এবং ধ্বনিগত দিক থেকে একটা তরঙ্গিত বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে দুটিরই দরকার হয়েছে। এইরূপ, যদৃচ্ছ-ভাবে উদাহরণ নিতে গেলে উল্লেখ্য, 'যথার্থ পরহিতব্রতধারী', 'শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ', 'শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে' (ক্রিয়াবিশেষণগুচ্ছ), 'অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু', 'রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য' ইত্যাদি।

এই রচনায় পুনরাবৃত্তির দিকটিও লক্ষণীয়। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তাৎপর্যপূর্ণ না হতে পারে, কিন্তু সংগতি রক্ষা করে এবং ঈষৎ বৈচিত্র্যের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হলে জোর দেওয়া ও আবেগ-সৃষ্টির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। 'রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল ; আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই', কিংবা, 'আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী' এই রকম কার্যকরী পুনরাবৃত্তি তো আছেই, বোধ করি পুনরাবৃত্তির চরম সৌন্দর্য ফুটেছে এই অংশেঃ 'ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী'—এখানে আবেগের উদ্বোধন এবং সমান উদ্দেশ্যে প্রতাপের প্রশস্তিরচনা একই প্রয়াসে নিষ্পন্ন হয়েছে।

শেষত, এই অংশের গদ্য-রচনার ছন্দ-সৌন্দর্য এক অসাধারণ

উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসের স্থানে স্থানে লেখককে আবেগধর্মী গদ্য-রচনা করতেই হয়, বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন, কিন্তু এখানে সৃষ্টির সেই বিরলতা পরিলক্ষিত, যার তুলনায় অন্য উদাহরণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, লেখক এখানে একটি মহৎ মৃত্যুর মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, আবেগোত্থ অথচ সোচ্চার নয়, বরঞ্চ শ্বসিত, খানিকটা চাপা। তাই বাক্যগুলি নাতিদীর্ঘ বা নাতিহ্রস্ব নয়। নিশ্চয়ই লেখকের চেষ্টাকৃত ফল নয়, কিন্তু তাঁর স্থির কল্পনা-দৃষ্টি বাক্যদৈর্ঘ্য অর্থাৎ ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে স্বতবৃত্ত সমতা দিয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বাক্যের অন্তর্গত অর্থনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি-বিভাগগুলি : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহের আবর্ত, তারপরই এসেছে প্রবাহের মুক্তি। যেমন, 'ব্রহ্মাণ্ডজয় * তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না', কিংবা, 'কে বুঝিবে.* আজি এই ষোড়শ বৎসর.* আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি'। যেন রুদ্ধ আবেগের ঢেউ ছোট থেকে বড় হতে হতে ছাড়া পেয়েছে॥

১৬

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না।

চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।[১]

আবেগ-জাগানো গদ্যের এটিও একটি সুন্দর নিদর্শন। রচনাটি সহজ, সরল, অথচ পাকা হাতের পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট।

একটি মৃত্যুঘটনাকে অবলম্বন করে লেখক এখানে যে আবেগটি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে একাধিক সমপাতী স্তর লক্ষণীয়। এর ভিত্তিভূমিতে রয়েছে, প্রথম অনুচ্ছেদে বিষাদ ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সান্ত্বনা; আবার দুটি অনুচ্ছেদকে অবলম্বন করে ফলশ্রুতিরূপে

রয়েছে বিস্ময়। অবশ্য, একটু পরেই আমরা দেখব এই ইমোশন বা আবেগ এখানে ঠিক পরিচিত, দেহীরূপে আসে নি।

প্রথমেই একটা কথা মনে রাখছি। বর্তমান রচনাংশের লেখক বলেছেন, মৃত্যু এমন একটি ঘটনা, যার রূপ নেই, যা মুছে দেয়। অথচ সেই নেতিকে অবলম্বন করেই তাঁকে আবেগ জাগাতে হয়েছে। এর সঙ্গে প্রতিতুলনায় পূর্ববর্তী উদাহরণে যা আমরা দেখেছি, বঙ্কিম-চন্দ্রের সুবিধে ছিল অনেকখানি: তিনি একটা উপসংহার করছিলেন এবং প্রতাপ, রমানন্দ স্বামী এবং শৈবলিনীর চরিত্র পেয়েছিলেন, যারা পাঠকের হৃদয় পূর্ব থেকে অধিকার করেছিল। কিন্তু, যদিও রবীন্দ্রনাথ এখানে মৃত্যু-ঘটনাকেই অবলম্বন করেছেন, তবু সেই মৃত্যু বিদেহী, এ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে, তিনি কোন কৌশলে পাঠক-চিত্তে অভিপ্রেত আবেগ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। এর থেকেও বিভিন্ন লেখকের অবলম্বিত রীতি-প্রকরণের পার্থক্য বোঝা যাবে।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত রীতিটি মূলত কাব্যিক এবং অন্যান্য উপাদানের সহযোগে প্রধানত পরম্পরিত রূপকচিত্র-রচনার দ্বারাই তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। 'জীবনের এই রন্ধ্রটির'—মৃত্যু সম্বন্ধে লেখকের কল্পিত এটি প্রধান রূপক, তারপর তিনি এরই সঙ্গে সম্পর্কিত রূপকসমূহের পরম্পরা রচনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, পরম্পরিত রূপকে উপমেয়ের মালার সমান্তরাল উপমানেরও মালা থাকে, যেখানে দুই ধারাই আমাদের চেনা। কিন্তু এখানে উপমেয় রূপহীন 'মৃত্যু' সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং প্রথম উপমানটি যদৃচ্ছ (arbitrary) হতে বাধ্য, যদিও সেটিই পরম সার্থকতা-মণ্ডিত হতে পারে, লেখক সেটিকে কেমন ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করে। 'রন্ধ্র' এই রূপকটি অর্থচিত্রের দিক থেকে যেমন, ধ্বনিগত দিক থেকেও তেমনি উপযোগী। এর উচ্চারণ একটু আয়াসসাধ্য, ধ্বনিপ্রবাহ এখানে

জোরে ধাক্কা খেয়ে কম্পিত হয়। তারপর আছে সেই রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে দেখা 'একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার'—যা দেখতে পাঠকেরও কোনো অস্থবিধে হয় না। 'ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই'—পাঠক এখানে নিশ্চয়ই কোনো ঘরের দেয়াল অনুভব করবেন, যার মধ্য 'রন্ধ্র' আছে। ঘরের দেয়াল মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে রুদ্ধতা, স্থতরাং তার থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা, 'যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না'। 'রন্ধ্র' থেকে আরম্ভ করে আমরা এখানে এক নতুন ছবিতে পৌছেছি। আর, একবার যখন একটি প্যাটার্ন তৈরি হয়ে উঠল, তখন ঠিক সমান প্যাটার্নের 'চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে'—এই রূপক পার্শ্ববিন্যস্ত করার কোনো অস্থবিধেই থাকে না। স্বহজ, সচ্ছন্দ অথচ অনিবার্যভাবে রূপকচিত্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি শুরু হয়েছে নতুন কথায়, কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদে যে পর্যায়-গতি (relay race) শুরু হয়েছে, তারই অনিবার্য একটি নতুন স্তর হিসেবে। ঘরের দেয়ালে রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে দেখা বাইরে অন্ধকার, চারাগাছের অন্ধকার ভেদ করে বাইরের আলোকে আসবার চেষ্টা, 'নাই' থেকে 'আছে'—তারপর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এল, 'দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল'—এ জিনিস নতুন হলেও পুরনো প্যাটার্নের সঙ্গে মিলে গেছে। পাঠক লক্ষ করবেন এই রূপকটির মধ্যেও 'রন্ধ্র' নিহিত আছে। যাই হোক, আর বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নাই, লেখক 'রন্ধ্র' এবং 'অতলস্পর্শ অন্ধকার' থেকে শুরু করে কীভাবে রূপক-পরম্পরার সহযোগে 'আশ্চর্য নূতন সত্যের' মধ্যে পাঠককে পৌছে দিয়েছেন, তা এখন সহজেই অনুসরণ করা যাবে।

লক্ষণীয় যে, লেখক এই বিচিত্র জগতের মধ্য দিয়ে আমাদের একটা পথ-পরিক্রমা করিয়েছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আমাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা তথ্যে পৌঁছে দেন নি। যে 'আশ্চর্য নূতন সত্যের' কথা উপসংহারে তিনি বলেছেন, তা পূর্বোল্লেখিত মৃত্যুর মতোই বিদেহী, এ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ যে আবেগোত্থ হৃদয়ের জাগরণ চান, তা হবে আলোড়নশীল, কিন্তু নির্দিষ্ট অবলম্বনে স্থির নয়। সেই জন্যই হয়তো, 'যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই' এইরূপ বৃত্তাকার রিজ্‌নিং-এর মধ্যে আমাদের ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন। আমাদের চিন্তাধারাকে নিদিষ্ট রৈখিক পথ-নির্দেশ করা অপেক্ষা 'এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না' এইরূপ হাতড়ে-বেড়ানো, বিপর্যস্ত সক্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় আবেগ জাগাতে চান; অথচ তা বিষাদ, হর্ষ, সান্ত্বনা যাই হোক না কেন, তা যে বিশুদ্ধ লিরিক কবিতার মতো অনির্দেশ্য হবে (পরিচিত, লোকায়ত রূপে আসবে না), তা বোঝা যায় লেখকের ব্যবহৃত বিশেষণগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। 'অতলস্পর্শ অন্ধকার' তবু অর্থবোধের সহায়তা করে, কিন্তু 'জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে', 'নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়াল', 'উদার শান্তি', 'বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণ' প্রভৃতি অংশের বিশেষণ বস্তুবোধের পোষকতা করে না, কিন্তু নিশ্চিতরূপে অনিশ্চিত আবেগের মধ্যে আমাদের মনকে মুক্তি দেয়। সেই রকম, যেখানে 'সত্যের' কথাটিতেই অর্থবোধ হয়, সেখানে 'আশ্চর্য নূতন সত্যের' প্রয়োজন হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা জিনিস লক্ষ করুন। মৃত্যুশোককে সান্ত্বনায় রূপান্তরিত করতে হবে, লেখক এখানে সেই বিপরীত কৃত্যটি হাতে নিয়েছেন। এপিগ্রাম-জাতীয় অলংকার বোধ হয় এ ব্যাপারে

সর্বাপেক্ষা সহায়ক। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই' —এই জাতীয় উক্তিতে লেখক সিদ্ধ। এখানে তাই স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, 'জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল', 'নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি', 'একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না' ইত্যাদি।

একই কথার বা একই রকম কথার পুনরাবৃত্তি আবেগ-জাগানোর দিক থেকে সহায়ক হতে পারে। 'যাহা নাই তাহাই মিথ্যা যাহা মিথ্যা তাহা নাই'—এই রকম কথা এই অংশে ঘুরে ফিরে এসেছে। " 'নাই'-অন্ধকার," " 'আছে'-আলোক," 'জীবনমৃত্যুর হরণপূরণ' প্রভৃতি এই জাতীয় প্রতিধ্বনিময় পুনরাবৃত্তির উদাহরণ।

শেষত, অনুচ্ছেদ দুটির গঠন-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করা প্রয়োজন। যদিও অনুচ্ছেদ দুটি একটি বৃহৎ প্রবন্ধের অংশমাত্র, তথাপি দুটি মিলে গঠনকলার এখন একটা সমগ্রতা সৃষ্টি করেছে যা অপূর্ব। অর্থবিস্তার গদ্যরচনার প্রধান লক্ষ হলে, অনুচ্ছেদগুলি এক একটি নিটোল ভাবগ্রন্থি হয়ে ওঠে, যদি তাতে রচনার শিল্প-নৈপুণ্য থাকে। এই অনুচ্ছেদ দুটি সেদিক থেকে সুগ্রথিত তো বটেই, প্রথম অনুচ্ছেদে বিচ্ছেদ-বেদনার প্রস্তাবনা ও শেষের অনুচ্ছেদে সান্ত্বনায় পরিসমাপ্তি —সনেটসুলভ নিটোল ঐক্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাক্যদৈর্ঘ্য ও বাক্যের অন্তর্গত ছন্দবিভাগগুলিও সেদিক থেকে লক্ষণীয়। লেখক নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব বাক্যসমূহ অবলম্বন করে এগোতে গিয়ে অনুচ্ছেদের শেষে (দুটিতেই) দীর্ঘতম বাক্যে পৌছেছেন—বক্তব্যের চরমতায় স্থির হবার জন্য। বাক্যের অন্তর্গত ছন্দবিভাগগুলিও, যেমন, 'জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া * যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, * তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল'—মোটেই হ্রস্ব নয়, পড়তে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে থামতে হয় না (বিশেষ ধরনের রচনার পক্ষে সেটাই বাঞ্ছিত হতে

পারে)—ফলে এই রচনার পক্ষে উপযোগী মন্থর, ঈষৎ-গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

অংশটির শব্দ-সমাবেশ তৎসম, কিন্তু উচ্চারণরীতি সংস্কৃতানুগ নয়; ক্রিয়াপদগুলি সাধুভাষার হলেও পাঠরীতি কথ্য ভঙ্গিমার। সুতরাং বিচিত্র, বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে লেখক একটি উৎকৃষ্ট আবেগধর্মী গদ্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

১৭

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল - ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ

আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"[১]

আবেগ-জাগানো গদ্যের এই উদাহরণটিতে স্বামী বিবেকানন্দ পাঠককে উৎসাহ-প্রদীপ্ত করে তুলতে চাইছেন। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, পাঠকের যুক্তি-বিচার বা চিন্তাশক্তিকে এখানে ক্ষণকালের জন্য যেন প্রচ্ছন্ন বা স্তব্ধ করে রাখতে চাওয়া হয়েছে (যদিও অংশটি 'বর্ত্তমান ভারত' এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদ এবং এটির আগে মাঝে মাঝে যুক্তি-বিশ্লেষণের প্রয়োগ আছে)। কারণ, সমস্ত অংশটা পড়ে পাঠক ঠিক বুঝতে পারেন না তাঁকে উচ্চাধিকার, না কি, স্বাধীনতা লাভ করতে, না কি, মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত হতে, না কি ভারতবাসী হতে বলা হয়েছে। তবে মহৎ একটা কিছু হয়ে উঠতে হবে এটা পাঠক অনুভব করতে পারেন এবং সেদিকে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই লেখকের অভিপ্রায়; স্থির বিচার-বিশ্লেষণ আবেগাত্মক গদ্যের স্বভাবলক্ষণ নয়।

দ্বিতীয়ত, লক্ষণীয় এই অংশের শব্দ-সংগ্রহ। লেখক এমন সব সুনির্বাচিত শব্দ এখানে প্রয়োগ করেছেন, যাতে হয় তাঁর সমকালীন, নয়তো ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ (association) জড়িত রয়েছে। 'পরানুবাদ', 'পরানুকরণ', 'পরমুখাপেক্ষা', 'দাসসুলভ দুর্ব্বলতা'— তখনকার দিনের নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই ঘৃণার আবেগ জাগাতে পারে। 'এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা'— যদিও এখানে অর্থ স্পষ্ট নয় (তৎকালীন সাহেবম্মন্য ভারতবাসী 'ইতর' ভারতবাসীর প্রতি যে ব্যবহার করত, তাই ?), তবু পূর্বোল্লেখিত শব্দগুলির সহযোগে এটি সেসব ত্যাগ করার জন্য বলিষ্ঠ আহ্বান। এই রকম শব্দ অংশটির আগাগোড়া ছড়িয়ে রয়েছে, প্রথম দিকের

আরো কয়েকটি উদাহরণ হল, 'উচ্চাধিকার', 'কাপুরুষতা' ও 'স্বাধীনতা'।

সমকালীনতা ছেড়ে তারপর লেখক দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী অনুষঙ্গ সম্বন্ধে যত্নপর হয়েছেন। 'নারীজাতির' এমনিতেই আবেগ সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে রয়েছে, 'সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'। তার পরের অংশ লেখকের পক্ষে কঠিনতর ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু তিনি তা সার্থকতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই'—এই দৃপ্ত বোধে পাঠককে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চান। করছেন এইভাবে; 'তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—' সাধারণ মানুষের যা কামনার জিনিস, যা সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রলুব্ধ করে, তা বলেই তৎক্ষণাৎ বললেন, 'নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে'। এখানে স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে বিপর্যস্ত করা হল। লক্ষণীয় ঐ '—' ড্যাশ ছেদচিহ্নটুকু, ওতে ভঙ্গিটা অনেকখানিই বদলে দেয়। তারপর যোগ করলেন, 'তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত'। এই সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকভাবে আসুক বা না আসুক এর অভিপ্রেত অর্থ স্পষ্ট হোক বা না হোক, পাঠককে ইতিমধ্যে আবেগের উচ্চগ্রামে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এরপর লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এই যে, লেখক এখানে রচনার নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি পরিহার করে সোজাসুজি পাঠককে সম্বোধন করেছেন এবং অনুজ্ঞায় কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই পাঠকের মুখেও সম্ভাব্য উক্তি বসিয়ে প্রার্থনার এবং মন্ত্রগ্রহণের ভঙ্গি সৃষ্টি করেছেন। এতে রচনার মধ্যে একটা বলিষ্ঠতা এবং সজীব প্রত্যক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে। এই রীতি নাটকীয় বৈশিষ্ট্যেও সমুজ্জ্বল বলা যেতে পারে।

বর্ণাঢ্যতা এই রচনার আরো একটি প্রেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আমার মনে হয়, বিশেষ ধরনের বিশেষণ প্রয়োগ এবং পুনরাবৃত্তি এ ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। 'দাসসুলভ দুর্ব্বলতা', 'ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা',

'লজ্জাকর কাপুরুষতা', 'উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর' প্রভৃতি এর উদাহরণ। 'বিশেষ ধরনের বিশেষণ' বলছি এই জন্যে যে, এতে বস্তুর পরিচ্ছিন্ন, সুস্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে না, যা সার্থক বিশেষণ মাত্রেই করে থাকে; বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখানে বিশেষণ বাহুল্য বলেই মনে হয়। যেমন, 'উমানাথ', 'ঘৃণিত' বা 'জঘন্য'—কিন্তু আবেগ সঞ্চার ও তাতে বর্ণ বৈচিত্র্য সম্পাদনের দিক থেকে এগুলো খুবই উপযোগী। এতে আবেগের প্রসার ও পেশলতাও সৃষ্ট হয়।

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির, প্রজ্ঞাপূর্ণ নয়, সেটা তাঁর বাঞ্ছিতও নয়। তিনি নিজেও চঞ্চল, আবেগোত্থ, সক্রিয়। তিনি ভীষণ জেদী—তাঁর শ্রোতাকে নিজের অনুভূতিতে, আদর্শ ও প্রার্থনায় তিনি টেনে আনবেনই। পুনরাবৃত্তি আহ্বান-মন্ত্রের মতো সেই লক্ষে কাজ করেছে। 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা' এর সুন্দর উদাহরণ: জিনিসটা একই, কেবল প্রত্যেকটিতে টোন বা বর্ণাভা বদলে গেছে। 'হে ভারত' এই সম্বোধন ঘুরে-ফিরে স্বরূপে বা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত, 'ভারতবাসী' অর্থে 'ভারত' —এই অলংকারটিও (ইংরেজী Metonymy) সমকালীন সতেজ স্বাজাত্যবোধ জাগাবার পক্ষে খুবই সুপ্রযুক্ত হয়েছ। 'ভুলিও না'-ও তাই। এ সবের ফলও অনেকখানি। 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী' না বলে লেখক পুনরাবৃত্তি পরিহার করে যদি বলতেন, 'মূর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল ভারতবাসী'—তাহলে বক্তব্য কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যেত, তা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন।

শেষত, কিন্তু যা মোটেই গুরুত্বহীন নয়, অংশটির ছন্দ। আপাত-দৃষ্টিতে এর ছন্দ একেবারে কাটাকাটা, ঠিক প্রবাহ বলতে যা বোঝায় তা এর ছন্দে নেই। কিন্তু এই বিশেষ রচনায় সেটি ত্রুটিপূর্ণ না হয়ে উৎকর্ষের কারণ হয়েছে। আগে উদাহরণ নিচ্ছি। গদ্যের ছন্দবিভাগ অর্থবিভাগ-নির্ভর। সেদিক থেকে, 'হে ভারত' এই

পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা* এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা…' এইরূপ ছন্দবিভাগ হতে পারত ; কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় তা নয় : তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে এ অংশ পঠনীয় হবে এইভাবে, 'হে ভারত,* এই পরানুবাদ,* পরানুকরণ,* পরমুখাপেক্ষা,* …' ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি ঘনঘন ধ্বনিগত ছেদ ফেলেছেন এবং প্রচুর কমা বা ড্যাস-চিহ্ন ব্যবহার করে পাঠককে সেই দিকেই নির্দেশ দিয়েছেন। বাক্যগত স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রোধ করেও, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, তিনি প্রায়ই শব্দ বা ক্ষুদ্র শব্দগুচ্ছকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। শ্বসিত আবেগ সৃষ্টির পক্ষে এই রীতি মোটেই কম উপযোগী নয় ॥

(অনুশীলনীর জন্য)

ট

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আস্‌বে? আমি রেলগাড়ী দেখ্‌বো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখ্‌বে?…সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আস্‌বে, এখনও দু'ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তোমায় কোথাও আন্‌তে চাইনে—এখন কি ক'রে দেখ্‌বে? সেই দুপুর একটা অব্‌ধি ব'সে থাক্‌তে হবে তা হোলে এই ঠায় রদ্দুরে, চল্ আস্‌বার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ… তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে

তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কি না, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্ব্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ···বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে··· উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে···নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

থল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্য্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রংএর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরী হইল। তাহার বাবা বলিল—তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দেখো তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহার থাকিবার স্থান করিয়া দিল।[১]

বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্য ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে বাক্যব্যয় বৃথা ; এবং এ-কথা যেহেতু মার্ক্‌স্‌-এরও অবিদিত ছিল না, তাই রাসেল্‌-এর বিচারে তিনি বের্গ্‌সন্‌, ড্যুই প্রমুখ উপযোগবাদীদের পূর্বপুরুষ। অবশ্য উক্ত সাদৃশ্য মার্ক্‌সীয় দর্শনের পক্ষে ক্ষতিকর নয় ; এবং ভাবনার স্বাধিকার যে মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনার চূড়ান্ত, সে-সম্বন্ধে আবার ফ্রয়েড্‌ মার্ক্‌স্‌-এর সঙ্গে একমত। কিন্তু প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞা শুধু যথাযথ নয়, তৃপ্তিকরও বটে ; এবং সন্তোষ-জনক মিথ্যা শেষ পর্যন্ত অপকারী ব'লে, তার আর যাথার্থ্যের প্রভেদকে যতই দুস্তর লাগুক, সময়ের মুখ চেয়ে অনৃতের অত্যাচার সওয়া স্বল্পায়ু মানুষের পক্ষে শক্ত। তাছাড়া অবিমিশ্র অপলাপ সর্বশক্তিমান্‌ একনায়কদেরই শোভা পায় : সাধারণ নর-নারী যে-সকল প্রসঙ্গের সম্মুখীন, সে-সমস্ত পুরোপুরি অপদার্থ নয় ; এবং নব্য ন্যায়ের কণাদেরা যদিচ এমন বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত যার পরে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণসাধ্য, তবু তাঁরা সুদ্ধ মানেন যে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা ফলিত বিজ্ঞানের তোয়াক্কা রাখে না। এখানে মনোবিকলনও তাঁদের সাক্ষ্য ; এবং সে-বিদ্যা যেমন দেখিয়েছে যে অবচেতনায় অবিরোধের লজিক্‌ অচল, তেমনি বিশ্বস্ফীতির আবিষ্কর্তা ডি সিটার লিখেছেন যে আকাশ বঙ্কিম না হলে, তাঁর অনুমান অমূলক, অথচ পরিমেয় শূন্য অন্তত এখনও ঋজু।

অতএব ব্রহ্মাণ্ড সর্ববিধ নিরুক্তির বহির্ভূত ; এবং মার্ক্‌স্‌-বাদে শুধু যে বিশ্ববৈচিত্র্যের স্থান নেই, তাই নয়, উপরন্তু তার সাহায্যে জটিল ব্যাপার এত সরল হয়ে আসে যে শ্রমলাঘবের লোভে তার অপপ্রয়োগ এক রকম অনিবার্য। ফ্রয়েড্‌-এর মনস্তত্ত্বও প্রায় সমান একদেশদর্শী ; এবং হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে মার্ক্‌স্‌-এর অনুবর্তন ক'রে তিনি যদিচ ঠিক বলেছেন যে, নরলোক নিষ্কাম কর্মের প্রতিকূল, তবু ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষ্য যত না অগ্রাহ্য, শিল্পসাহিত্যের যৌন টীকা ততোধিক অবান্তর। পক্ষান্তরে পরমার্থের পরিভাষা জনান্তিকের জয়ধ্বনি ; এবং বোঝা-পড়া স্বভাবত দ্বিমুখী, এমন কি উক্তি ও উপলব্ধির ক্রোচে-প্রস্তাবিত অদ্বৈত যেকালে

স্বতঃপ্রমাণ, তখন প্রাতিস্বিক আদান-প্রদানে সাধারণ্য মধ্যস্থ। অগত্যা মানুষমাত্র বস্তুস্বাতন্ত্র্যের বশবর্তী; এবং সম্ভবত সেই জন্যে দুর্মর শ্রেণীস্বার্থের মতো স্বয়ংবশ চিত্তবৃত্তিও জড়বাদে বদ্ধমূল। তবে সোহংবাদী সদা-সর্বদা মনে রাখতে বাধ্য যে, বস্তুপ্রভব জ্ঞান সুদ্ধ ব্যক্তিগত ব'লে, দার্শনিকের তথাকথিত প্রমাণ তার ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসের নামান্তর; এবং অবিনয়ের অভাবে সে আর যার শ্রদ্ধা হারাক, অন্তত অকপটের প্রশ্রয় পাবে। কেননা, অনিশ্চয়কে ডরায় ধর্মধ্বজেরা; এবং দেকার্ত্-এর আগেও অগণিত ভাবুক যেমন সংশয়ের দীক্ষা নিয়েছিলেন, তেমনই হিউম্-ই নির্মম মনীষার শেষ প্রতিনিধি নন।

দর্শনাদি যে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা, তার অন্যতম কারণ আমার মধ্যে উল্লিখিত নিরাসক্তির শোচনীয় অনটন; এবং শুধু ফ্রয়েড্ কেন, রাসেল্ সুদ্ধ রটিয়েছেন বটে যে মৌল বিশ্বাসের সমর্থনে পরিপক্ব বুদ্ধির নির্বন্ধ সর্বসাধারণের অভ্যাস, অথচ আমার সঙ্গতি তো আমারই, তদুপরি তা আজও এতাদৃশ অসম্পূর্ণ যে তার দৃষ্টান্ত যেমন অপর কারও উপকারে লাগবে না, তেমনি আমি অবশেষে মানতে বাধ্য যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দূরের কথা, সাহিত্য-সংক্রান্ত সামান্যীকরণে পর্যন্ত আমি সচরাচর একচক্ষু, কচিৎ-কদাচিৎ হঠকারীও। অর্থাৎ আমার তত্ত্বজিজ্ঞাসায় জ্ঞানার্জনী বৃত্তির শুদ্ধি নেই; প্রধানত নিজস্বের দৈন্য ঘুচবে ভেবেই আমি পরের ধনে পোদ্দার; এবং সেইজন্যে আমার পাঁচমিশালী মালপত্রে কোনও একচেটিয়া কারবারের কাজ চলবে না। কিন্তু বর্তমান সংগ্রহে ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা যদিও মুখ্য, তবু সনাতন সত্যসমূহ গৌণত বিপন্ন যুগধর্মের আত্মজৈবনিক বিকারে; এবং তাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সমধিক ব'লেই, জড়বাদ আমাকে টানেনি, পুরুষ পরম্পরার বৈপরীত্য-বশতও আমি মরমী প্রাগল্‌ভ্যের জাতশত্রু। প্রসঙ্গত আরও স্মরণীয় যে, রুশ বিপ্লবের কাছে আমার প্রত্যাশা ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় যে-আতিশয্য দেখিয়েছিল, তার নিপাত যত স্বাভাবিক, ততই দুর্বিষহ; এবং তাই আমার বর্তমান হতাশা, বিষাক্ত না হোক, তিক্ত।[১]

এলিঅট বলেছিলেন ভালো কবিতা গদ্যের বিশিষ্ট ধর্মগুলিকে আত্মসাৎ করে। কথাটাকে উল্টো করেও বলা যায় যে, ভালো গদ্যের অভ্যন্তরে কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলিও অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে। অন্তত, সাম্প্রতিক কালের বাংলা গদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, কবিরাই ভালো গদ্য লিখেছেন, বা বাংলা গদ্যের এক একটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেছেন। একথা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে।

কথিত আছে, সুধীন্দ্রনাথ মূলত সমকালীন পাশ্চাত্য কাব্য-জগতের সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের 'পরিচয়' করিয়ে দেবার জন্য উক্ত নামের পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রেতর রীতি-প্রকরণের প্রবর্তন করেন, তা, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, মূলত পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিল। তাঁদের রচিত গদ্যের সম্বন্ধেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আমরা সুধীন্দ্রনাথের রচিত যে গদ্যাংশটি বিশ্লেষণের জন্য উদ্ধৃত করেছি, প্রথম দৃষ্টিতেই তার রীতি-প্রকরণের মধ্যে এমন একটা অতি প্রখর স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে যে মনে হয় বাংলা গদ্যের সহসা একটা গোত্রান্তর ঘটেছে: সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মতো তাঁর গদ্যকেও অচেনা লাগে।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার যে তিনটি অনুচ্ছেদ আমরা উদ্ধৃত করেছি, তার শেষটিতে লেখকের একটি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, 'তাই আমার বর্তমান হতাশা, বিষাক্ত না হোক, তিক্ত'। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার জন্য লেখক কিছু তথ্য ও যুক্তি-বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েছেন। এবং সেই অংশ অতিক্রম করতে গিয়ে পাঠককে সর্বপ্রথম যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, তা হচ্ছে কঠিন দুর্বোধ্যতা। সুতরাং সেই বিষয়েই আমরাও প্রথম অবহিত হব। আর, সেজন্য, রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, সমালোচকের 'দেখা কর্তব্য লেখক গ্রন্থ

বিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে'[১]—ঠিক সেই কথাটাই আমাদের মনে রাখতে হবে।

প্রত্যেক প্রতিভাবান লেখকের মতো সুধীন্দ্রনাথেরও বলবার নিজস্ব ভাষা আছে, সেই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নিজেও তিনি সচেতন, 'আমি বহুদিন যাবৎ সোঽহংবাদের শরণাপন্ন'। সেই ভাষার স্বরূপ কী ?

সুধীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (এবং সেটাই সাধারণত পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে), এ পর্যন্ত মানুষের অর্জিত এবং অর্জিতব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তিনি দ্রুত বিচরণ করেন। কারণ, লেখক নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমার আত্মদর্শন অনেকান্ত'। বর্তমানে আলোচ্য অংশে তিনি উল্লেখ করছেন, এই তিনটিমাত্র অনুচ্ছেদেই, মার্ক্স্‌, রাসেল্‌, বের্গ্‌সন্‌, ড্যুই, ফ্রয়েড্‌, কণাদ, ডি সিটার, ক্রোচে, দেকার্ত, হিউম্‌ প্রভৃতি অন্তত দশজন মনীষীর (Authority) নাম, যাঁরা তাঁদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে এক একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর, এঁদের প্রসঙ্গে, এবং তার বাইরেও তিনি উপযোগবাদ, মার্ক্‌সীয় দর্শন, মনোবিকলন, নব্য ন্যায়, ফলিত বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন; করেছেন 'ব্যাবহারিক সত্য', 'ভাবনার স্বাধিকার (freedom of thought),' 'প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞা', 'সর্বশক্তিমান্‌ একনায়ক', 'অবচেতনা', 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভাষ্য', 'শিল্প-সাহিত্যের যৌন টীকা', 'সংশয়বাদ', 'মরমী প্রাগল্‌ভ্য' প্রভৃতি অজস্র ধারণার (concept) উপস্থাপনা।

এখন, বিভিন্ন জগতের মনীষী, বিভিন্ন শাস্ত্র বা concept-এর

উল্লেখের জন্যই যে সুধীন্দ্রনাথের রচনা দুর্বোধ্য ঠেকে তা নয়; কেননা, এর আগে আমরা দীপ্তি ত্রিপাঠীর যে রচনাংশ উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণ করেছি, তাতেও প্রায় অনুরূপ কৃত্য ছিল। কিন্তু দীপ্তি ত্রিপাঠী যেখানে কোনো শাস্ত্র বা মনীষীর নাম উল্লেখ করে তার থেকে প্রাসঙ্গিক গ্রাহ্য বস্তুটি নিজে সংগ্রহ করে এনে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন (যে ক্ষেত্রে আমরা লেখিকার বক্তব্যকেই সোজাসুজি পাচ্ছি), সেক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ মোটেই তা করছেন না: তিনি কোনো মনীষী বা বাদের উল্লেখ করলে তাদেরকেই পাঠকের সামনে রাখেন। ফলে, পাঠককে থমকে গিয়ে পরিশ্রম করতে হবে, তৎকথিত মনীষীকে বা শাস্ত্রকথাকে অনুধাবন করতে হবে, এবং তখন, আর তখনই তিনি দেখবেন সুধীন্দ্রনাথ তারই মধ্যে কোথায় অবস্থান করছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন এবং অস্তিত্ববান। একটা উদাহরণ গ্রহণ করছি :

> বিশ্বস্ফীতির আবিষ্কর্তা ডি সিটার লিখেছেন যে আকাশ বঙ্কিম না হলে, তাঁর অনুমান অমূলক, অথচ পরিমেয় শূন্য অন্তত এখনও ঋজু।

এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি প্রতিজ্ঞার কথা উপস্থাপিত হয়েছে: বিশ্বলোকে জ্যোতিষ্কগুলি নিজেদের কক্ষপথে আবর্তন করতে করতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের মধ্যেকার আকর্ষণী শক্তি ক্রমশিথিল হয়ে যাওয়ার জন্য; সুতরাং বিশ্বলোক বৃদ্ধিশীল। যাঁরা এ তত্ত্ব নির্ণয় করেছেন, তাঁরা আকাশ বঙ্কিম এই প্রস্থানভূমি (premise) স্বীকার করে নিয়েই এগিয়েছেন। কিন্তু শূন্য বা space-এর বঙ্কিমতা (curvature) আমাদের ধারণায় আসে না এবং যে-কোনো বঙ্কিমতা অনন্তের পটভূমিতে সরল রেখায় পরিণত হয়। সুতরাং 'বিশ্বস্ফীতির'-র (Expanding Universe) ধারণাটি স্ববিরোধী।

সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য : কোনো শাস্ত্র বা জ্ঞান বিরোধহীন নয়;

সুতরাং কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে Doctrinaire বা সাম্প্রদায়িক হবার অবকাশ নেই। আর, সুধীন্দ্রনাথকে সেইখানে পেতে হলে পাঠককে আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐ তত্ত্বটি আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ অলস পাঠককে তিনি প্রতি পদে অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের পথ ঘুরিয়ে আনতে চান। কিন্তু পদে পদে বিভিন্ন, এমন কি বিরোধী, শাস্ত্রের উল্লেখ করা কেবল পাঠকের জন্য নয়: প্রকৃতপক্ষে, কোনো সৎ লেখকের পক্ষে সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। মুখ্যত, সুধীন্দ্রনাথের নিজের মানসিক গঠনই হচ্ছে ওই রকম, 'নানা মুনির নানা মত মনে রেখে পরিণামী সত্যের অভিমুখে আস্তে আস্তে' এগোন।

সুধীন্দ্রনাথের রচনায় দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের বিপুল সমারোহ ছাড়া তাঁর দুর্বোধ্যতার অপর কারণ, তাঁর আহৃত শব্দব্যূহের প্রকৃতি: তাঁর শব্দগুলি প্রধানত ধ্বনিভার অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, যার অনেকগুলি বিদেশী (প্রধানত ইংরেজী) শব্দের অনুবাদস্পৃহায় গঠিত। এখানেও সুধীন্দ্রনাথ বহু পঠন ও যত্নপর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিস্বভাব সক্রিয় হয়েছে অর্থবহ নতুন শব্দের গঠনে এবং পুরাতন শব্দকে নতুন অর্থদ্যোতনা দেওয়াতে—যা ভালো গদ্য-লেখকেরও বিশিষ্ট ধর্ম। বহু-ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করতে তিনি অতিশয় কুণ্ঠিত। তাঁকে যে ধ্রুপদী রীতির লেখক বলে মনে করা হয়, তার তাৎপর্য বোধ করি তাঁর এইরূপ শব্দ-সমাবেশ রীতির মধ্যেই নিহিত। যদৃচ্ছভাবে উদাহরণ নিতে গেলে, 'ব্যাবহারিক সত্য', 'উপযোগবাদীদের পূর্বপুরুষ', 'ভাবনার স্বাধিকার', 'মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনা', 'বিশ্বস্ফীতি', 'নিরুক্তি', 'জনান্তিকের জয়ধ্বনি', 'প্রাতিস্বিক', 'প্রমা', 'নির্মম মনীষা', 'নিরাসক্তির শোচনীয় অনটন', 'মরমী প্রাগল্‌ভ্য' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের উল্লেখ করতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে অর্থচিত্রকে অত্যন্ত প্রখর ও উজ্জ্বল করে তোলার জন্যই তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং

পাঠকের মনোযোগের ক্ষণকালের জন্যও স্তিমিত হয়ে পড়ার অবকাশ নেই : তাঁকেও অর্থগ্রহণে যত্নপর ও একাগ্র হতে হবে।

সুধীন্দ্রনাথের ভাষার শব্দসমূহের উৎস এবং সমাবেশ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। আগেই বলা হয়েছে, তাঁর শব্দগুলি ধ্বনিভার সংস্কৃত ; সে সবের কতকগুলি সোজাসুজি সংস্কৃত থেকে তাঁর নিজের অর্থে গৃহীত, কিংবা, ইংরেজীর অনুবাদের প্রয়োজনে তৎকর্তৃক গঠিত— যেমন, 'ব্যাবহারিক সত্য', 'ভাবনার স্বাধিকার', 'স্বতঃপ্রমাণ', 'নির্মম মনীষা' প্রভৃতি। এসব কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথ যেমন এই রকম অজস্র ধ্রুপদী শব্দ আহরণ করেছেন, তেমনি তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে অতিচলিত মুখের বোলও ব্যবহার করেছেন, যেমন, 'তোয়াক্কা রাখে না', 'অনিশ্চয়কে ডরায়', 'রটিয়েছেন', 'আমার সঙ্গতি তো আমারই', 'দৈন্য ঘুচবে', 'পরের ধনে পোদ্দার', 'পাঁচমিশালী মালপত্র', 'কারবার' প্রভৃতি। এই সব চল্‌তি কথার খণ্ডাংশ পরিমিত প্রয়োগে সমগ্রভাবে রচনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

যুগ্মতা (Ambiguity) সৃষ্টি তাঁর রচনার অন্যতম ধর্ম। পূর্ব-কথিত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের পরিশীলিত তথ্য যেমন পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়, তেমনি তারই ওপর সমাপতিত সুধীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবিও তাঁর সম্মুখে ভেসে ওঠে। এর একটি উদাহরণ একটু আগেই আমরা গ্রহণ করেছি। তাছাড়া, তাঁর আহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মধ্যেও যুগ্মতা-সৃষ্টির এই লক্ষণ আভাসিত। তাঁর ব্যবহৃত অনেক শব্দ আছে যা অন্যান্য শাস্ত্রের কথা বা ভিন্নতর অনুষঙ্গের কথা মনে করিয়ে দেয়। এতে পাঠকের মনকে সর্বদা সজাগ ও চলিষ্ণু রাখে, তাছাড়া বর্ণনার মধ্যে নানা রঙ ও সমৃদ্ধি সঞ্চার করে। 'ভাবনার স্বাধিকার'—লেখকের অভিপ্রেত অর্থ, freedom of thought ;কিন্তু 'মেঘদূত'-এর 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' কথাটা আমার মনে পড়ে। 'অনৃত' কথাটি বৈদান্তিক অনুষঙ্গ-জড়িত :

এর সরল অর্থ 'মিথ্যা' কিন্তু 'মায়া', 'অলীক' তার অঙ্গে লীন হয়ে আছে। 'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দটিও এইরূপ পৌরাণিক অনুষঙ্গ-জড়িত। 'অপদার্থ'—শব্দের অর্থ শ্লিষ্ট। 'নিরুক্তি' = নির্বচন, নিঃশেষে বলা; কিন্তু ধ্বনিগত শ্লেষের আভাসও এতে পাওয়া যায়, মানে, 'নিরুক্ত' কথাটা মনে এসে পড়তে চায়। 'নরলোক নিষ্কাম কর্মের প্রতিকূল'—'নিষ্কাম কর্ম' একই সঙ্গে গীতা, মার্ক্‌স্‌ ও ফ্রয়েড্‌কে টেনে আনে। 'সাধারণ্য' = সাধারণ; কিন্তু 'অরণ্য' কথাটা টেনে এনে 'সাধারণ' শব্দের অর্থকে বঙ্কিম করে তোলে। 'সোহংবাদী'—লেখকের অভিপ্রেত অর্থ Individualist; কিন্তু এটি শংকরের বিখ্যাত উক্তিও। এইরূপ শব্দ 'একচক্ষু'। 'জ্ঞানার্জনী বৃত্তি'—বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের কথা। ইত্যাদি।

এর পরে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের অর্থবিস্তার-ক্রমের প্রতি লক্ষ করা প্রয়োজন, যেখানে তাঁর নিজের উক্তি, 'আমি আবাল্য যুক্তির ভক্ত', আমাদের সহায়ক হয়। নিজের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, যা আমরা আগেই লক্ষ করেছি, তিনি যেমন বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে প্রচুর তথ্য-সমাবেশ করেন, তেমনি করেন সেই সব তথ্যের চুল-চেরা বিশ্লেষণ। তিনি প্রায় সব শাস্ত্রেরই নজির গ্রহণে উৎসাহী, 'কপালদোষে আমি কবি বা কোবিদ নই, পল্লবগ্রাহীদের পদাঙ্কচারী', কিন্তু তিনি সচেতন যে, কোনো শাস্ত্রই অভ্রান্ত, অন্তর্বিরোধমুক্ত বা সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাসী, এবং অবিশ্বাসীও। তাঁর তীক্ষ্ণ মনীষা কোথায় কোন্‌ শাস্ত্রের অন্তর্বিরোধ রয়েছে তা যেমন অভ্রান্তভাবে দেখিয়ে দেয়, তেমনি যে সব শাস্ত্র পৃথক্‌ ও বিরোধী বলে সাধারণত স্বীকৃত, সে সবের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য রয়েছে তাও পাঠকের সামনে তুলে ধরে। যেমন, 'ভাবনার স্বাধিকার যে মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনার চূড়ান্ত, সে-সম্বন্ধে আবার ফ্রয়েড্‌, মার্ক্‌স্‌-এর সঙ্গে একমত।' এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিস্ট'।

সেদিক থেকে, প্রতিপক্ষের গোঁড়ামিকে আঘাত করতে হয় বলে, তাঁর রচনার মধ্যে অন্তর্নিহিত উইট বা ব্যঙ্গের ঈষৎ রেশও অনুভূত হয়। তাঁর কণ্ঠস্বর প্রসন্নগম্ভীর হয়েও মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ও মুখের হাসি বঙ্কিম হয়ে ওঠে। 'অবিমিশ্র অপলাপ সর্বশক্তিমান একনায়ক-দেরই শোভা পায়', 'দর্শনাদি যে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা, তার অন্যতম কারণ আমার মধ্যে উল্লিখিত নিরাসক্তির শোচনীয় অনটন', 'নিজস্বের দৈন্য ঘুচবে ভেবেই আমি পরের ধনে পোদ্দার' প্রভৃতি তার দু'একটি উদাহরণ।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের বাক্যগঠন ও তৎসম্পৃক্ত পদ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বাক্যগঠনের যে রীতি এখানে অনুসরণ করেছেন তা একান্তই তাঁর নিজস্ব এবং সাধারণ বাংলা বাক্‌রীতির তুলনায় তা খানিকটা অচেনা এবং কৃত্রিম বলেও মনে হয়। তার কারণ, আমার মনে হয় (এবং এটা একান্ত ব্যক্তিগত দায়িত্বেই বলছি), তাঁর বাংলা বাক্যগুলি যেন ইংরেজী বাক্যের প্রতি-ধ্বনির মতো লাগে। ধরুন, উদ্ধৃত অংশের প্রথম বাক্যটি যদি অনুবাদ করা যায় :

> That is to say, it is sterile to think about anything other than practicable propositions. And since this was not unknown even to Marx, so, according to Russel, he may be called the forerunner of the utilitarianısts like Bergson, Dewey and others.

তাহলে তার ফলটা কি দাঁড়ায়? একথা সত্য যে, এই পরীক্ষামূলক ইংরেজী অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথের মেজাজ এবং কণ্ঠস্বর অনেকটা বদলে যায়, কিন্তু বোধ হয় তা অচেনা এবং কৃত্রিম বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত, সুধীন্দ্রনাথ প্রায়ই বাংলার সাধারণ বাক্‌রীতির অনুসরণে ক্রিয়াপদ দিয়ে বাক্য শেষ করেননি। তাঁর বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদ প্রায়ই উহ্য, কিংবা ক্রিয়াপদ মাঝখানে রেখে বিধেয় বিশেষ্য বা বিশেষণ দিয়ে বাক্য শেষ করেছেন। এতে বাক্যের মসৃণ প্রবাহ

ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং কতকটা হোঁচট-খাওয়া কাঠিন্য ও কর্কশতার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথক্‌ভাবে এই রীতি যাই হোক না কেন, তাঁর রচনার সামগ্রিক মেজাজের সঙ্গে সমঞ্জসীভূত তা বলা যায়। ঠিক এই প্রসঙ্গেই লক্ষণীয়, তিনি সাধারণত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেন। সরল, সংক্ষিপ্ত বাক্য তাঁর আসে না, জটিল ও যৌগিক বাক্যেই তাঁর চিত্তের সম্যক্ স্ফূর্তি হয়।

পদ-প্রকৃতির দিক থেকে বলা যায়, যেমন বিধেয় বিশেষণ, তেমনি গুণবাচক বিশেষণও তিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। বিশেষণের কাজ যেমন বর্ণনীয়কে সুস্পষ্ট, পরিচ্ছিন্ন মূর্তি দান, তেমনি তার মধ্যে বিচিত্র রঙেরও সঞ্চার করা। আর, সুধীন্দ্রনাথ, যিনি মালার্মের কাব্যাদর্শকে নিজের অন্বিষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি যে প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে যত্নপর হবেন সেটাই প্রত্যাশিত। 'সন্তোষজনক মিথ্যা', 'তৃপ্তিকর প্রতিজ্ঞা', 'নির্মম মনীষা', 'শোচনীয় অনটন', 'মরমী প্রাগল্‌ভ্য', 'আত্মজৈবনিক বিকার' প্রভৃতি অংশের বিশেষণ শুধু বস্তুকেই পরিচ্ছিন্ন করছে না, এগুলোর মধ্যে লেখকের মনোভঙ্গি বা এ্যাটিচ্যুড্ মিশ্রিত থেকে বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

আলোচ্য অংশে বিশেষণ ছাড়া অপর যে পদটি তিনি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে অব্যয়। অর্থাৎ, এবং, অবশ্য, অতএব, কিন্তু, সুতরাং, যে, তবু প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অব্যয় তিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এগুলো একদিকে তাঁর প্রসরণশীল মনোভঙ্গিমার সূচক জটিল ও যৌগিক বাক্যগঠনে যেমন তাঁকে সাহায্য করেছে, তেমনি মননশীল যুক্তিবিস্তার (logicality)-এর যে বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনার প্রধান লক্ষণ, তাকেও ফুটিয়ে তুলেছে।

শেষত, অলংকার-প্রয়োগের কথা। স্বভাবতই প্রচলিত রীতির অলংকার প্রয়োগ তিনি করেননি, নিরাভরণ কাঠিন্যই তাঁর লক্ষ। কিন্তু মননশীল রচনার পক্ষে যা অপরিহার্য, সাদৃশ্যকথন (এ্যানালজি),

বৈপরীত্যসৃষ্টি (কন্‌ট্রাস্ট্) বা বিপরীত-বিন্যাস (এ্যান্টিথিসিস) তাঁর রচনায় প্রতিপদেই লক্ষ করা যায়। তাছাড়া, যে অলংকারটি অতি সহজে তাঁর রচনায় এসে গেছে, তা হচ্ছে অনুপ্রাস ; এবং শব্দের অভিপ্রেত অর্থ বজায় রেখে অভিরাম ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করা তাঁর মতো কবির পক্ষে প্রত্যাশিতও। রচনাটির সর্বত্রই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে আমরা কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলে দিচ্ছি : 'অনৃতের অত্যাচার', 'অবিমিশ্র অপলাপ', 'নব্য ন্যায়ের কণাদেরা', 'অবচেতনায় অবিরোধের লজিক অচল' ইত্যাদি। আরো চমৎকার হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জন ও স্বরের কুশলী সমাবেশে তরঙ্গিত ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি করা : 'তিনি বের্গ্‌সন্, ড্যুই প্রমুখ উপযোগবাদীদের পূর্বপুরুষ', 'ভাবনার স্বাধিকার যে মানুষী আত্মপ্রবঞ্চনার চূড়ান্ত', 'মরমী প্রাগল্‌ভ্যের জাতশত্রু' ইত্যাদি। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, সুধীন্দ্রনাথ বাক্য শেষ করেন প্রায়ই নামপদ দিয়ে ; তাতে বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহে যে কাঠিন্য ও কর্কশতার সৃষ্টি হয়, এই প্রকার ধ্বনিসাম্য সৃষ্টির দ্বারা তার অনেকখানি শমিত হয়েছে বলা যায়॥

১৯

পরাবাস্তবী

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝভুম্বুল গোছের। তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্‌কুম্‌কুর।

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্‌কুম্‌কুর। পাঠশালার

পেডেঙ্গোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুস্‌কলিয়ে। বুকের ভিতর করতে থাকত কুড়ুক্কুর কুড়ুক্কুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্‌কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুম্‌কি। একটু রসুন—বুঝিয়ে বলি। পেডেঙ্গো কথাটা বালিদ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখে পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেঙ্গো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত—ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচস্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্যভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সদ্ধ্বংস্বনিত হার্দিক্যে বুদবুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ডুণ্ডুমানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আন্‌তারা ফাঁচ্‌কলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মম্‌মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকুষ্ট স্বরিৎক্রম্যস্ত পর্যুগাসন উথ্‌ৱংসিত—

... ...

বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিণর্ধম্মিত গর্গরায়ণকে পরমস্তি শয়নে সমুসদ্‌গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত ব'লে বাচস্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচস্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বই-কি। সমুদ্রগুপ্ত অজাতশত্রুকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্‌গারিত করে দিলে গো—একেবারে পরমস্তি শয়নে।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ায়

ইস্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচস্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বাবফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুফ্লুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজড্‌ দি গর্ব্যাণ্ডিজম্‌ অফ হুমায়ুন। —শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্‌ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্‌কায়িত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্‌ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুম্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঙ্গুসের একেবারে চিকৃচাকস্‌ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।[১]

উদ্ধৃত অংশটির আলোচনা শুরু করার আগে রবীন্দ্রনাথের তৎসাময়িক সৃষ্টিসমবায়ের পটভূমিকার ওপর মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর শিল্পি-মানসিকতার বিভিন্নধর্মী স্তর লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে যে মানসিকতা প্রকাশিত, তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিতে তার থেকে পৃথক্‌ আর এক জিনিস চোখে পড়ে, এবং আরো ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায় তাঁর চিত্রকলা এবং 'সে', 'গল্পসল্প' প্রভৃতি গদ্য-রচনায়।

আমাদের আলোচ্য গদ্যাংশ এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মধ্যে শিল্পীর মানস-প্রেরণার সাদৃশ্য আছে। তাই তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে অতিপ্রাসঙ্গিক দু'একটি কথা মাত্র (কারণ, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে) বলে নিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে বলছেন, 'আমার হচ্ছে—

যা ইচ্ছে তাই। কাগজ রং নিয়ে যা মনে হোল তাই আঁকলুম, মনের সঙ্গে রঙ্ তুলি নিয়ে খেলা খেললুম। সেই হচ্ছে আমার ছবি।' এই উক্তির থেকে যদি আমরা কোনো অন্তর্নিহিত শিল্প-রীতির অনুসন্ধান করতে চাই, তাহলে তা দাঁড়াবে সম্ভবত এই রকম: চিত্রী আগে আঁকতে আরম্ভ করেছেন, তারপর সেইভাবে কোনো একটা কিছু ছবি হয়ে উঠেছে। এটা ঐতিহ্যাগত রীতির বিপরীত ক্রম, কেননা পূর্বে শিল্পী কোনো বস্তু-কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য রঙতুলি ধরতেন; অর্থাৎ আগে আসত কল্পনা তারপর আঙ্গিক।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ এটাকে তাঁর মনের মুক্তির লীলা বলে মনে করতেন—তার ফলে ছবি যা-ই দাঁড়াক না কেন।

তৃতীয়ত, শিল্পী যেমন যা খুশি এঁকে বসেন, ছবির বোদ্ধাও তাকে অবলম্বন করে যা-খুশি দেখে থাকেন। আধুনিক পরাবাস্তবী (surrealist) চিত্রকলায় এমন অনেক উদাহরণ আছে, যাকে সামনে থেকে দেখলে একটা কিছু যে জিনিস দেখায়, উল্টে ধরলে বা মনে মনে উল্টো করে দেখলে, সম্পূর্ণ আর এক জিনিস ফুটে ওঠে। সেখানে হয়তো একটা ফুল, একটা ভৌতিক মানুষের মুখ এবং পাহাড়ের গুহা সব একসঙ্গে সমীকৃত হয়ে যেতে পারে। এই জাতীয় পরাবাস্তবী শিল্পীরা বস্তুত যা করতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে স্বাধীন অনুষঙ্গ সৃষ্টি করা এবং পরিচিত পরিবেশের বিপর্যয় সাধন করা:

> **'...a statue in a street or some place where it would normally be found is just a statue, as it were, in its right kind; but a statue in a ditch or in the middle of a ploughed field is then an object in a state of surrealism ...It has, in fact, the quality of a dream image, when things are so often incongruous and slightly frightening in their relation to time or place.'[১]**

স্বভাবতই, এর থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, অবচেতন মনের ওপরই এই সব শিল্পীরা নির্ভর করেছেন অনেকখানি। নন্দলাল বসু এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি স্বীকার করে লিখেছেন, 'পূর্বে ছিল আগে ভাবনা, পরে তার প্রকাশ আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে। এখন কখনও কখনও দেখি, প্রথমে আঙ্গিকের প্রকাশ, পরে তাতে ভাবনার সংযোজন। আসলে ঐরূপ প্রতিভাবান আধুনিক শিল্পীর অবচেতন মনে ভাবনা লুক্কায়িত থাকে মাত্র এবং গোপনে আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রিত করে।'[১]

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে প্রথমে ফরাসী ও পরে ইয়োরোপের অন্যান্য সাহিত্যে প্রতীকী আন্দোলনের পর পরাবাস্তবী আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সংবেদনশীল শিল্পিচিত্ত এই সবের প্রায় প্রতিটি নতুন আন্দোলনকে প্রথম অভিনন্দিত করেছে। কবিতায় এবং নাটকে তিনিই প্রথম প্রতীকী প্রবর্তনাকে রূপ দান করেন; আর এইমাত্র যা উল্লেখ করেছি, চিত্রকলায় এবং গদ্যে তিনি ধরবার চেষ্টা করেন পরাবাস্তবী শিল্প-প্রেরণাকে। অবশ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে, তিনি যা গ্রহণ করেছেন, তা নিজের প্রেরণার মতো রূপান্তরিত করেছেন। একটু পরেই আমরা তা দেখব।

তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর গদ্য-রচনায় ইংরেজির মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ যে সেই প্রবণতাকে স্পর্শ করেছেন, তা সম্ভবত ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ইংরেজি গদ্য সাহিত্য থেকে ছোট্ট একটি উদাহরণ নিয়ে তার লক্ষণগুলি অনুসরণ করছি, যা আমাদের আলোচ্য অংশের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হতে পারে :

He passed Saint Joseph's, National School. Brats' clamour. Windows open. Fresh air helps memory. Or a lilt. Ahbeesee defeegee kelomen opeecue rustyouvee

double you. Boys are they ? Yes. Inishturk. Inishark. Inishboffin. At their joggerfry. Mine. Slieve Bloom.[১]

সমালোচকেরা জয়েসের এই রচনার পিছনে যে মানসিকতা সক্রিয় হয়েছে, তাকে বলেছেন চৈতন্যপ্রবাহ বা 'Stream of consciousness'। দেখছি যে, 'He' যখন পথ অতিক্রম করছে, তখন তার মনের ভাবনাগুলোকে লেখক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ভাবনাগুলো অসংলগ্ন, কতকটা স্টেনোগ্রাফীয় রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। তার মন একটা চিত্র বা ভাবনা থেকে আর এক চিত্র বা ভাবনায় সরে যাচ্ছে, কখনও নিকট কখনও দূরস্থিত অনুষঙ্গের প্রভাবে। প্রথমে 'He' পার হল সেণ্ট জোসেফের গির্জা, তারপর ন্যাশন্যাল স্কুল। মনে এল শিশুদের (brat শব্দটা অবজ্ঞাসূচক) চেঁচামেচি। তারপর খোলা জানালা—হতে পারে স্কুলের, হতেও পারে রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর। খোলা জানালা স্বভাবতই 'Fresh air'-এর অনুষঙ্গ টেনে আনছে, তার থেকে স্মৃতি, তার থেকে 'lilt', সংগীত। brats-দের চেঁচামেচিই কি সংগীত ? তার প্রকৃতি কি ? সেই চেঁচামেচিটা 'He'-র মনে যে ভাবনার সঞ্চার করছে তাকে ঠিক প্রচলিত শব্দ দিয়ে বোঝানো যায় না।

তখন জয়েস শব্দ গঠন করতে আরম্ভ করলেন। এখানে ধ্বনি ও অর্থের আভিধানিক 'সহিতত্ব' বিপর্যস্ত করে নতুন ধ্বনির দ্বারা নতুন অর্থদ্যোতনা শুরু হল। বাস্তব যেমন অবচেতনের গভীরে প্রায় অচেনা রূপ পরিগ্রহ করে অথচ বাস্তবের সঙ্গে একটা দূরবর্তী সম্বন্ধও থাকে—এখানেও তেমনি আভিধানিক শব্দগুলোকেই ভেঙেচুরে জোড়াতালি দিয়ে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। এই শব্দগুলো যেমন একান্তভাবে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি বহন করছে, পাঠকও ঠিক তেমনি সেগুলোর অর্থগ্রহণে একান্তভাবে ব্যক্তিগত বোধের দ্বারা পরিচালিত হন। নতুন শব্দগুলোর এক-আধটার বাঁকাচোরা রূপ

ও অর্থদ্যোতনা অনুসরণ করার চেষ্টা করছি—বলা বাহুল্য অর্থনির্ণয় প্রয়াসের ফলাফলটা যেমন অন্য পাঠকের, তেমনি বর্তমান সমালোচকের একান্ত নিজস্ব হতে পারে (এই শ্রেণীর লেখক যেমন শব্দগঠনে নিজে মুক্ত হতে চান, তেমনি পাঠককেও অর্থগ্রহণের ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে তাঁর আপত্তি নেই)।

Ahbeesee—শব্দটাকে তিন ভাগ করা যাক ; ah আবেগসূচক অব্যয় ; bee মৌমাছিরা, স্কুলের কাচ্চাবাচ্চাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতেই পারে ; see—দেখা, দর্শনীয়, চোখে বানান না দেখে 'sea' মনে করাও যায়। তিনটে মিলে ঝাঁক-বাঁধা বাচ্চাদের নতুন অভিধা তৈরি হল। defeegee—de অবজ্ঞাসূচক prefix ; fee-এর অর্থ 'inherited estate',[১] উত্তরাধিকার, বংশক্রম ; gee—'colloq. horse (orig. child's wd)'[১]—তিনটে মিলে কী অর্থ হল : ঘোড়ামুখো বাচ্চা ? নাও হতে পারে। Kelomen—হতে পারে, কেল্ট-জাতীয় লোকেদের অর্থাৎ চাষাভুষোদের বাচ্চা। Opeecue —opaque থেকে এসেছে ?—যার ল্যাটিন মূল 'opacus (shaded)'[১]—ধরা যাক, 'বেয়াড়া'। একটু ছেড়ে দিচ্ছি। Boys are they ? Yes.' এরপর তিনটি শব্দ, পূর্ণচ্ছেদের দ্বারা তিনটি বাক্যও। বাচ্চাগুলোকে বোধহয় গালমন্দ করছেন। প্রথম শব্দ দুটোর শেষাংশ turk এবং shark গালমন্দ হিসেবেও আমাদের চেনা ; তৃতীয় শব্দের boffin ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো dolphin এবং/বা coffin-এর ধ্বনি-সংস্কার বহন করতে পারে। এদের প্রত্যেকটার আগে রয়েছে inish—ল্যাটিন prefix 'in' এবং ইংরেজি বিশেষণীয় suffix, '-ish'। এখন সব মিলে অর্থ কী হয় ভাবুন। Inishark-এ আবার Inish এবং shark জুড়ে গেছে, ছোটদের বাংলা 'সন্দেশ' পত্রিকায় যেমন গরু+রুই=গরুই, হাঁস+ সজারু=হাঁসজারু প্রভৃতির মতো শব্দ-খেলা চলে। যাই হোক,

গালাগালটা বোধহয় চরমে পৌঁছেছে, 'joggerfry' শব্দে। jog—নাড়া দেওয়া, তার থেকে jogger—ধরা গেল, 'নড়ে-চড়ে-বেড়ানো'। fry—'young of other creatures produced in large numbers e.g. bees or frogs'।[১] bee কথাটা তো আমরা আগেই পেয়েছি। অলমিতি ॥

জয়েসের যে রচনাংশ তুলে নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করেছি, তার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার পার্থক্য আছে অনেকখানি। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প'-এর আসর গড়ে উঠেছে দাদামশায়, নাতনি কুস্‌মি, সভাপতি, বাচস্পতি, অটলদা প্রভৃতিকে নিয়ে—কবির মধ্য বয়সের লেখা 'পঞ্চভূত'-এর আসরের একটা নতুন সংস্করণের মতো। আলাপচারিতা সুতরাং হাল্‌কা ঢঙের, বিশেষ করে যেখানে দাদামশায় গল্প বলছেন আর নাত্‌নি গল্প শুনছে মূল পরিকল্পনাটা গড়ে উঠেছে এরই ওপর। পক্ষান্তরে, 'Ulysses'-এর মেজাজ গম্ভীর: হোমারের মহাকাব্যের একটা নতুন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় একটি মাত্র দিনের জীবনকে চিত্রিত করে—যার পটভূমি ডাবলিন শহর এবং প্রধান চরিত্র হচ্ছে Leopold Bloom, তার স্ত্রী Molly এবং Stephen Dedalus। অবচেতন মনের ধারণাকে দু'জনেই কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে আবরণ দিয়েছেন রূপকথার, কল্পনার; আর জয়েস বাস্তব ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন dream-sequence-এর রীতিতে, যেখানে, উদাহরণত, একটা রেস্তোরাঁয় আপরাহ্নিক চা-পানের ঘটনা একটা নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ আবহাওয়া-পরিমণ্ডল তৈরি করে। তৃতীয়ত, এলিঅটের 'Waste Land' এবং জেম্‌স্ জয়েসের 'Ulysses'-কে সমালোচকেরা যথাক্রমে 'art of compression' এবং 'art of expansion'-এর চরম উদাহরণ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ গল্প বলার

রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া সমস্ত ছদ্মবেশের অন্তরালে যদিও উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবতার নির্ভুল ছায়াপাত ঘটেছে, তথাপি জয়েসের বাস্তবতা ধূমবাষ্পপূর্ণ শ্বাসরোধকারী, আর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পরিবেশটাই কৌতুকোদ্ভাসিত সহজ রসের। শেষত, জয়েস্ যতিচিহ্ন নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন, মাঝে মাঝে তা বর্জনও করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ যতি-চিহ্নের সহজ রীতি বজায় রেখেছেন।

কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে উভয় লেখকের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। জয়েসের প্রেক্ষাপট পরিকল্পনায় রয়েছে, 'at once farcical and sordid, trivial and significant';[১] 'গল্পসল্প'-এও দাদামশায়ের হাসি-তামাসার মাঝে মাঝে এসেছে লঘু ও গম্ভীর, সুন্দর ও বীভৎস, তুচ্ছ ও সমুন্নত। জয়েস মিল্টন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কবির কবিতা ও ছড়া উদ্ধৃত করেছেন গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে; রবীন্দ্রনাথও করেছেন।

আর, উভয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্য রয়েছে আচমকা অভিনব শব্দগঠনের ক্ষেত্রে। জয়েসের প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে, এখন রবীন্দ্রনাথের কথা। 'বাচস্পতি' নামটাই শব্দ-গঠনের দিকে ইঙ্গিত করে। গল্পের ভূমিকায় পরাবাস্তবী শব্দ-সংগঠনের তত্ত্বটি কবি নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, 'ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধরে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে।' তিনি নিজেই একটা উদাহরণ দিয়েছেন:

> আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে, 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্ হিদিকারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

নতুন-বানানো শব্দগুলোর অর্থায়নের জন্য নির্ভর করতে হবে, স্পষ্টতই, শব্দ-সম্পৃক্ত ইন্‌স্টিংক্‌টের ওপর। নায়কের দিনরাত 'হিদ্‌হিদ্ হিদিক্কার'—সম্ভবত বোঝায় অবিরত গদ্‌গদ প্রেমভাষণ; 'হিদিক্কার'—হিক্কার (বিবমিষা) এবং ধিক্কারের সংস্কার জাগিয়ে তুলতে পারে। 'পাঁজঞ্জুরি'—সমস্ত পঞ্জরব্যাপী, তার অলিগলি সমেত; 'তিড়িতঙ্ক'—তিড়িং তিড়িং জাতীয় আক্ষেপ-আলোড়ন, আবার 'আতঙ্ক'-এর কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখন উদ্ধৃত অংশের দু'একটি শব্দ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে (অন্য জন সম্পূর্ণ অন্য রকমও করতে পারেন):

বুঝ্‌ভুম্বুল—ভোম্বল=হাঁদা; বুঝ্‌-এর সঙ্গে ধ্বনিসাম্য রক্ষার জন্য ভুম্বুল করা হয়েছে; অর্থ, যার বোঝাটা গোলমেলে।

একটু আগেই যে আমরা উল্লেখ করেছি, এই জাতীয় রচনায় একই সঙ্গে লঘু ও গম্ভীর, তুচ্ছ ও মহৎ, ব্যঙ্গ ও প্রশস্তি অবস্থান করতে পারে, সেটি তার গঠিত শব্দগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যেমন,

সধ্বংস্থনিত—সধ্বং: সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি-সংস্কারকে অংশত মনে করিয়ে দেয়। 'ধ্বংস' কথাটাও মনে পড়ে। বিপরীত হয়ে গেল কিন্তু। স্থনিত—নিঃসৃত-এর অপভ্রংশ নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বনিত-কেও মনে পড়ায়।

হার্দিক্য—'হার্দ্য' থেকেই আসছে মনে করুন; 'আধিক্য' স্বচ্ছন্দে রূপান্তরিত হয়ে জোড়া লেগেছে; কিন্তু 'সর্দি' ভাববেন?—হঠাৎ একটা ব্যঙ্গের জন্য?

বুদ্‌বুধিদের—এর মূল ধরা যাক, 'বুধ', জ্ঞানী। 'বুধি' বললে অবজ্ঞাসূচক হল। 'বুদ্‌বুদ্' স্বচ্ছন্দে আপনার মনে আসতে পারে, তাচ্ছিল্যার্থে।

নিরংকরাল—'নিরলংকার' এবং 'করাল' এর জোড়কলম নিশ্চয়ই।

২০

স্বপ্নসংশ্লেষী

ফটিক আবার চারপাশ দেখে কেউ যে তাকে সাহায্য করবে না বুঝতে পেরে পিছিয়ে পড়ার মুহূর্তে হঠাৎ-ই কানের কাছে মুখ নিয়ে 'আপনার নাম' বলার সঙ্গে সঙ্গে গান-বিভোর যুবকটি তড়িৎ-গতিতে লাফিয়ে উঠে লহমায় ফটিকের গলা ধ'রে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে 'মজাকি না' বলতে বলতে শরীরের শিরা-উপশিরা এমন ঝনঝনালো যে যখন সে অফিসার-এর ঘরে হাজির তখনও 'মজাকি না' কথাটি ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তার সমস্ত শরীর সমূলে বিধ্বস্ত করছে।

অফিসার মিঃ এস. কে. ভট্টাচার্য, বি. এ., এল. এল. বি., ফোন নামিয়ে রেখে ফটিকের সমস্ত বিবরণ শুনে 'দেখছি' ব'লে কলিং-বেল টিপতে পাঁড়ে এসে দাঁড়ালে তিনি যুবকটিকে ঘাড় ধ'রে বের করার হুকুম দিলে পাঁড়ে তবু অনড় থাকায় ভট্টাচার্য হুঙ্কার দিলেও সে তদ্-অবস্থায় বিড়-বিড় করে, 'সাব, উন্‌লোক-কে সাথ', পাঁড়ের ভীত ত্রস্ত চোখ জানিয়ে দিল যে, দু-দশ পাঁড়ে এলেও অবাঞ্ছিত যুবকটিকে অফিস থেকে বের করা সম্ভব নয়,

সঙ্গে সঙ্গে অফিসারের চেহারা পাল্টে গেল যেন যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়, তিনি ফাইলে মন দিতে দিতে বললেন, 'আচ্ছা, ইউ ক্যান্ গো নাউ, আই উইল সী', ফটিক তবু দাঁড়িয়ে থাকে, 'আজকের এ্যাটেন্‌ডেন্সটা—', ভট্টাচার্য ঐ অবস্থাতেই 'আপনি আমায় রিপোর্ট করলেন, আই উইল সী দেন্' বললে 'ক্যাজুএল লীভ কি নেবার—' ভট্টাচার্য মাথা নাড়ালেন, 'নো নো' বলা শেষ না হতে একটা বিচিত্র শব্দ সহযোগে যুবকটি ঢুকল অফিসারের ঘরে।

'কি কম্‌প্লেন করছিলেন মশাই', তারপর ভট্টাচার্যকে সরাসরি প্রশ্ন করে, 'কিছু কম্‌প্লেন করেছে কি ?'

তখন ভট্টাচার্য ঢোক গিলে 'না মানে, আমার স্টাফ তাই, মানে অনেকদিন আছেন তো', কথা কেড়ে নিয়ে যুবকটি বলে, 'তাই লেট্ ক'রে

অফিস আসবে, তাই না ?' ততক্ষণে ফটিক মরিয়া, 'লেট আমি করিনি, আমাদের অফিস আওয়ার্স সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা, এখনও সাড়ে দশটা বাজেনি, বাজতেও এখন—'

তার আগেই যুবকটি গর্জায়, 'অফিস বসবার আগেই এসেছেন! লক্ষণ তো মন্দ নয়, টু পাইসের—' তখন ফটিক

'স্যার বলেছিলেন জরুরি কাজ আছে তাই', ততক্ষণে ভট্টাচার্য সায়েব নড়ে চড়ে বসলেন, 'ফটিকবাবু ঠিকই বলেছেন, একটা আরজেন্ট ফাইলের—'

'চুপ করুন', যুবকটি ফেটে পড়ল, 'চোখে ধুলো দিচ্ছেন, বেয়াদপি কিছুতেই সহ্য করব না', তারপর ফটিকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'কতদূর ?' ফটিক প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে 'আমি বি. এ অনার্স, আপনি—', সঙ্গে সঙ্গে ফটিক বলে ওঠে 'বি. এ.' এবং বলেই কেমন একটা সম্ভ্রম নিয়ে যুবকটিকে দেখে, 'ভেবেছিলাম মূর্খ গবেট রাস্তার ছেলে, অথচ ছেলেটি—' বিস্ময় বাড়তে থাকলে এবং সেই সময় যুবকটির সমস্ত মুখের রেখাগুলো হঠাৎ একটা মুহূর্তে এমন এক অবস্থানে শিলীভূত হয়ে যায় যে, সঙ্গে সঙ্গে বি. এ. অনার্স ছেলের সঙ্গে রাস্তার রামা-শ্যামার কোনও তফাৎ থাকে না। ফটিক তার মুখে সেই নির্মমতা লক্ষ্য ক'রে ভয় পেয়ে ভট্টাচার্য সায়েবের দিকে তাকালে ভট্টাচার্যও যে বিশেষ নিরাপদ বোধ করছেন না তার চোখের তথাকথিত স্বাভাবিক দৃষ্টিব মধ্যে ঐ ভয়ের ছাপ দেখে খানিক পিছিয়ে যাবে যাবে মনে করার ক্ষণে 'সোজা বাড়ি চলে যান, বেশী তেড়িবেড়ি করলে, তাছাড়া আমি তো আপনার চেয়ে যোগ্য লোক' বললে ফটিকের মুখে কোনও কথা জোগালো না, তার দেহে বোধহয় তখন স্পন্দন নেই, সে কোনমতে এ ঘর এ অফিস ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে, 'বি. এ. অনার্স!' ফটিকের বিস্ময় যেন কাটে না ; 'যান, এক্ষুণি', যুবকটির উক্তি যে ফাঁকা বুলি নয় তা বুঝতে দেরি হলো না, কারণ তখন সে অফিসারকে শাসাচ্ছে, 'অযোগ্য লোকদের নিয়ে আসর জমিয়েছেন, করাপসনের মূল আমরা উচ্ছেদ করবো, ভাববেন না যে—'

ফটিক বেরিয়ে আসতে আসতে অফিসার ভট্টাচার্যের প্রায় কাকুতি মিনতির স্বর শুনতে পায়, অতএব আর একপলও অফিসের চত্বরে থাকা

নিরাপদ নয় ভেবে হঠাৎ-ই 'ভারি আমার বি. এ. অনার্স, টুকলি ক'রে পাশ করেছে' ভাবতে ফটিক হৃত বল ফিরে পেয়ে অফিসারের ঘরে গিয়ে ছেলেটিকে আচ্ছা ক'রে মেরে আসবে কিনা ভাবতে সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির দৃঢ় ভঙ্গি স্পষ্ট কথা বলার ধরন এবং সব কিছু ছাড়িয়ে মুখের নির্মমতা ইত্যাদি মিলেমিশে এমন এক অবস্থা তৈরি করল যে, সে আগের চেয়েও বেশি ভীত শঙ্কিত হয়ে প্রায় ছুটে রাস্তায় নেমে পড়ে।[১]

মনে করুন একটা মাটির পুতুল আপনার সামনে টেবিলের ওপর দাঁড় করানো আছে। তার চোখ-মুখ-নাক-হাত-পায়ের গড়ন আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আপনি পুতুলটাকে ঘুরিয়ে রাখলেন, এখন আপনি সেটার সামনেটা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনি জানেন সেটার চোখ-মুখ-নাক-হাত-পায়ের গড়ন তেমনি আছে। তারপর আপনি ঘরের দূর কোণে কাচের পাল্লা দেওয়া আলমারির ভেতর পুতুলটা রেখে এসে যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে তাকালেন। দূরত্ব এবং কাচের (স্বচ্ছ হলেও) আড়ালের জন্য পুতুলটা ঈষৎ ছোট এবং অস্পষ্ট দেখাবে। কিন্তু সেটার চোখ-মুখ-নাক-হাত-পা একই রকম আছে। আলমারির ভেতর একটা টিকটিকি কখন ঢুকে বসেছিল আপনি লক্ষ করেন নি; সেটা ঐ পুতুলের ওপর লাফিয়ে পড়াতে উল্টে গেল। আপনি ছুটে গিয়ে দেখলেন পুতুলের ডান হাতটা ভেঙে গেছে। আপশোষ। কিন্তু তখনও তার চোখমুখের রূপ বদ্‌লায় নি, এমন কি ভাঙা হাতটারও নয়।

এখন একটু অন্য রকম কল্পনা করুন। মনে করুন আপনি পুতুলটাকে স্বপ্নে দেখছেন। তখন হয়তো সমস্ত প্রক্রিয়াটা এই রকম দাঁড়াতে পারে: আপনার টেবিলের ওপর পুতুলটা

রাখলেন, দেখতে দেখতে পুতুলটা কুঁকড়ে একটু বেঁটে হয়ে গেল, এবং ডান হাতের তুলনায় বাঁ-হাতটা বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে। পুতুলটাকে ঘুরিয়ে রাখলেন আগেকার মতো, আশ্চর্য এই যে, আপনি পিছনটা দেখছেন কিন্তু এখন যেন কী করে সেটার মুখের সামনেটাও আপনার দিকে ঘুরে এসেছে। সেটার মুখের একাংশই আপনি দেখতে পাচ্ছেন শুধু তাই নয়, দুটো চোখের আকার দু'রকম হয়ে গেছে। রেখে এলেন ওটাকে আগেকার মতো আলমারিতে। নাঃ, কেবল মাথাটা ছাড়া আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, চুলগুলো বড়ো হয়ে সমস্ত মুখটাকে ঢেকে ফেলেছে প্রায়। টিকটিকিটা লাফিয়ে পড়ার পর এবারেও ছুটে গেলেন। না, ডান হাতটা ভাঙে নি, কী রকম ঝুলে পড়েছে, আর যেন লোহার রডের মতো আকৃতি পেয়েছে ; আর সর্বোপরি পুতুলটা শুয়ে-পড়া অবস্থায় অদ্ভুত লম্বা হয়ে গেছে। হাত-মুখ-নাক-চোখ আছে কিন্তু ঠিক আগেকার রূপে নেই।

এখন, দুটো উদাহরণেই পুতুলটার পরিবর্তন হচ্ছে ; কিন্তু প্রথমটার পরিবর্তন হচ্ছে স্থির, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, আর দ্বিতীয়টা, যদিও আগাগোড়া পুতুলটা পুতুলই থাকছে, তবু তার পরিবর্তন নিয়ম অনুসারে হচ্ছে না : কার্যকারণ-পরম্পরার বন্ধনটা যেন শিথিল হয়ে গেছে॥

আমরা যে উপন্যাসের একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করেছি, তাতেও রিয়ালিটি বা বাস্তবতার যেন একটা স্বপ্ন-প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে অবশ্য বাস্তবতারও কিছুটা মিশোল রয়েছে। অংশটির মূল চরিত্র ফটিক এবং তার সঙ্গে রয়েছে আরো তিনটি চরিত্র—যুবক, অফিসার মিঃ ভট্টাচার্য এবং পাঁড়ে। এ চরিত্রগুলি প্রতীকী নয়, চরিত্রই—কিন্তু গল্প উপন্যাসের পরিচিত চরিত্রের ঘটনা-সম্পৃক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এগুলোর মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না।

পরিবেশটা একটা অফিসের, তার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোও উপস্থাপিত। যে মানুষ দিয়ে চরিত্র তৈরি হয়, তার ভয়-বিস্ময়-ক্রোধ-কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বৃত্তিগুলিও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলটা বেঁকেচুরে যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

ফটিক এক অফিসের কর্মী, কিন্তু অফিসে পৌঁছে সে দেখলে তার চেয়ার দখল করে এক আগন্তুক যুবক বসে আছে। শুধু তাই নয়, যুবকটি 'গান-বিভোর': অপ্রত্যাশিত রূপান্তর শুরু হল সেখান থেকেই। 'আপনার নাম' জিজ্ঞেস করতেই যুবকটি উঠে ফটিকের গলা ধরে ঝাঁকাতে লাগল, আর ফটিকের নাম জিজ্ঞেস করাটাকে 'মজাকি না' বলে অভিহিত করল।

ফটিক তার উপরওয়ালা অফিসারের কাছে ছুটে এল—এখন এই চিত্রটা স্বাভাবিক। ঘটনার বিবরণ দেওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু অফিসার যখন তাকে যেতে বললেন, তখন তার প্রতিক্রিয়া কি হল? কী সে চাইল?—না, 'আজকের এ্যটেন্‌ডেন্সটা—।' অদ্ভুত নয় কি! তারপরও সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ক্যাজুএল লীভ' নেবে কি না। পাঠক এখানে ফটিকের প্রত্যাশিত নৈরাশ্য-ক্ষোভ-ক্রোধ প্রভৃতি ভাব লক্ষ করেছেন কি?

যুবকটির সম্পর্কে ফটিকের প্রতিক্রিয়া আরো খানিকটা অনুসরণ করা যাক। 'লেট আমি করিনি···' ইত্যাদি বলে ফটিক কৈফিয়ৎ দিতে আরম্ভ করেছে যুবকটির কাছে; কিন্তু তার কাছে জবাবদিহি সে করবে কেন? ব্যাপারটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে না কি? তার পরের স্তরে যুবকটির সম্বন্ধে ফটিকের প্রথমে বিস্ময়, তারপর সম্ভ্রম এবং আগাগোড়া ভয়ের অনুভূতি জাগছে। কিন্তু কিসের জন্য? না, যুবকটি 'বি. এ. অনার্স' আর সে নিজে 'বি. এ.' বলে। এখানেও সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলো যেন এক জায়গার জিনিস রোপণান্তরিত (transplanted) হয়ে আর এক জায়গায় দেখা দিচ্ছে।

এই রোপণান্তর প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে অফিসার মিঃ ভট্টাচার্য, বি. এ., এল. এল. বি., পাঁড়ে এবং যুবককেও লক্ষ করতে হবে। অফিসারের প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক—বিবরণ শোনা এবং পাঁড়েকে ডেকে আগন্তুক যুবককে ঘাড় ধরে বের করে দিতে বলা। পাঁড়ে অনড় থাকে—যা তার পক্ষে আনুগত্যহীনতা। তাতে অফিসার কি পাঁড়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন? না, যেন যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় তাঁর চেহারা পাল্টে যায়, তিনি ভয় পান এবং আগন্তুক যুবককে নয়, ফটিককেই এড়িয়ে যেতে চান। যুবকটি সশব্দে ঘরে ঢুকে ফটিক সম্বন্ধে যখন জানতে চায় যে, সে নালিশ করছিল কিনা, তখন অফিসার ঢোক গেলেন এবং ফটিকের পক্ষে কৈফিয়তের সুরে কথা বলতে থাকেন।

তারপর যুবকটি। প্রথমে সে 'গান-বিভোর', তারপর আক্রমণকারী, তারপর তর্জনশীল। ফটিক এবং অফিসার দুজনের প্রতিই তর্জন-গর্জন করে: কে সে? সে দুটি সামাজিক সমস্যার প্রতিকার চায়, দুটিই অদ্ভুত। 'বি. এ.'-র থেকে 'বি. এ. অনার্স' যোগ্যতর লোক! অফিসে লেট করে আসা এবং লেট না করে আসা দুটোই তার কাছে সমান অপরাধ। এই সব 'করাপশন'-এর মূলোচ্ছেদ করতে চায় সে: অদ্ভুত এবং মজার, নয় কি?

একটু আগে 'ভয়' কথাটা উল্লেখ করেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত রচনাটির মধ্যে যাকে বলে আতঙ্কমনস্কতা (fear-psychosis) তা পরিব্যাপ্ত হয়ে একটা বিশিষ্ট ভাবাবহ সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু ভয়ের উত্তেজনা-সাড়ার (stimulus-response) সম্পর্কটা বিপর্যস্ত করা হয়েছে। ফটিকের প্রথম ভয় পাওয়াটাই তার উদাহরণ: কেন সে একটি যুবককে তার আসনে বসে থাকতে দেখে ভয় পেল? মানুষ হঠাৎ ভয় পেতেও পারে, কিন্তু তারপর? ফটিক ভয় পেয়ে অফিসারের কাছে এল, পাঁড়ে ভয় পেল, ভীত হলেন অফিসারও। কার কাছে?—না, আগন্তুক যুবকটির কাছে। শেষে আবার ফটিক,

তার মনে হল, 'আর একপলও অফিসের চত্বরে থাকা নিরাপদ নয়'। মুহূর্তের জন্য যদিও তার হৃত বল ফিরে আসার উপক্রম হল, তা কেবল 'আগের চেয়েও বেশি ভীত শঙ্কিত হয়ে প্রায় ছুটে রাস্তায় নেমে' পড়ার জন্য।

উদ্ধৃত রচনার যে বৈশিষ্ট্য আমরা এ পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছি, তাতে বাস্তবতার এমন একটা প্যাটার্ন লক্ষ করি, যা কাফ্কাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বপ্নলোকে বিচরণ করতে করতে মানুষ যেমন জাগ্রত জগতের বস্তু ও অভিজ্ঞতাগুলোকেই পায় কিন্তু কোথাও অবিকল, কোথাও পরিবর্তিত রূপে, আবার তাদের বিন্যাস ও সমবায় কোথাও বা প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করে, কোথাও করে না, এক্ষেত্রে সেই রীতিই অনুসৃত হয়েছে। নিশ্চিতরূপেই এটি আধুনিক বাস্তবতার স্বপ্ন-প্রতিচ্ছবি। আধুনিক বাস্তবতা বহুমুখ, নানা বিচিত্র শৃঙ্খলহীন ঘাত-প্রতিঘাত-সংকুল। স্পর্শকাতর বিভ্রান্ত চিত্তের উপর তার প্রতিক্রিয়া কোথাও ন্যূন, কোথাও অতিশয়িত, কোথাও বা আকস্মিক হয়ে অহরহ দেখা দিচ্ছে।

কাফ্কার সঙ্গে যদিও সাদৃশ্য রয়েছে বর্তমান রচনার, তথাপি পার্থক্যও মোটেই কম নয়। তা হচ্ছে রচনার প্রকৃতি ও উৎকর্ষের স্তরভেদ নিয়ে। কাফ্কার রচনায় (উদাহরণত, 'The Castle', 'Trial' প্রভৃতি) চরিত্র ও ঘটনা-চিত্র আপাত-নিরীহ এবং আপাত-সহজ, কিন্তু একটা অদ্ভুত প্রেতবৎ ছায়ালোক (weird spectacle) সৃষ্টি করে তোলে। তাঁর কল্পিত রিয়ালিটি অনেক বেশি জটিল এবং গুরুভার বলেই হয়তো তিনি আপাত-অনাসক্তির মনোভঙ্গি আগাগোড়া বজায় রাখতে পেরেছেন।

আর একটি বিষয়ে কাফ্কার সঙ্গে কার্তিক লাহিড়ীর গুরুতর পার্থক্য আছে, তা হচ্ছে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কাফ্কা উপন্যাস রচনার প্রচলিত রীতি মেনে নিয়েই বাক্যগঠন, সংলাপ-রচনা ও অনুচ্ছেদ-বিন্যাস করেছেন। কিন্তু কার্তিক লাহিড়ী ছেদ-

চিহ্ন ব্যবহার করলেও অর্থবিভাগগুলিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বরঞ্চ জেম্‌স্‌ জয়েসের সঙ্গে তাঁর আংশিক মিল রয়েছে। ঠিক পূর্ববর্তী উদাহরণের আলোচনায় আমরা জয়েসের একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাক্যের আদি-অন্ত ছেঁটে ফেলে একটি epithet-কে বা কেবল সম্প্রসারক সহ কর্তাটিকেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। 'Ulysses'-এর শেষ অধ্যায়ে জয়েস একেবারেই বর্জন করেছেন ছেদপ্রকরণ। সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে জনৈক সমালোচক লিখেছেন :

> 'Here, with the abandonment of punctuation, there seems to be a more consistent attempt actually to reproduce the stream of consciousness'[১]

কার্তিক লাহিড়ীর রীতি এখানে মিশ্র-প্রকৃতির। তিনি প্রত্যাশিত স্থানে কোথাও ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, কোথাও করেননি এবং যেখানে করেছেন সেখানে উপযুক্ত চিহ্ন বসাননি। যেমন, যেখানে দাঁড়ি প্রয়োজন, সেখানে তিনি কমা দিয়েছেন। বোধহয়, স্বপ্নের মধ্যে যে সংগতিহীনতা দেখা দেয় এও তার প্রতিরূপ। আর যেখানে তিনি বহুক্ষণ যাবৎ প্রায় ছেদচিহ্নই ব্যবহার করছেন না, যেমন,

> **অফিসার মিঃ এস. কে. ভট্টাচার্য বি. এ., এল. এল. বি., ফোন নামিয়ে রেখে ফটিকের সমস্ত বিবরণ শুনে 'দেখছি' ব'লে কলিং-বেল টিপতে পাঁড়ে এসে দাঁড়ালে তিনি যুবকটিকে ঘাড় ধ'রে বের করার হুকুম দিলে পাঁড়ে তবু অনড় থাকায় ভট্টাচার্য হুঙ্কার দিলেও সে তদ্‌-অবস্থায় বিড়বিড় করে, 'সাব, উন্‌লোক-কে সাথ্‌' পাঁড়ের ভীত ত্রস্ত চোখ জানিয়ে দিল যে দু-দশ পাঁড়ে এলেও অবাঞ্ছিত যুবকটিকে অফিস থেকে বের করা সম্ভব নয়,**

সেখানে, মনে হয়, তিনি স্বপ্নচিত্রের প্রবাহকেই (flow of dream-images) অক্ষুণ্ন রাখতে চাইছেন।

উদ্ধৃত রচনাংশে বাক্য ও অনুচ্ছেদগঠনও সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। লেখক ঘন ঘন অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ব্যবহার এবং যতটা পারেন সাপেক্ষ বাক্যাংশ বা বাক্য গঠন করেছেন। মাঝে ছেদ-চিহ্ন নেই, সুতরাং এই অংশগুলো পরস্পরের সঙ্গে লগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, চোখে দেখেও যেখানে অনুচ্ছেদ শেষ হল বলে পাঠক মনে করতে পারেন, সেখানেও তিনি হয়তো একটি কমা-চিহ্ন দিলেন, নয়তো কোনো চিহ্নই দিলেন না। এ সবের দ্বারাও ঐ একই স্বপ্নচিত্র-প্রবাহকে সংকেতিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে ॥